বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কার

বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কার

সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়

ভারত পাবলিশার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
স্বাতী ভট্টাচার্য
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মূল্য : তের টাকা মাত্র

প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল, ১৯৮৯

মুদ্রক :
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

গ্যালিলিওর আবিষ্কার

ইটালি দেশের পিসা শহরের এক গির্জার অভ্যন্তর। তার ছাদ থেকে নেমে এসেছে একটা শিকল। তা থেকে ঝুলছে একটা ঝাড়লণ্ঠন। উপর দিকে জানালাগুলি খোলা এক একবার হাওয়া আসছে সে জানালা পথে। আর দুলছে সে ঝাড়টা। গির্জায় বসেছিল একটি ছেলে। সে ঝাড়ের দোলনটা লক্ষ্য করছিল। তার মনে হল দোলনটা বেশি হ'ক বা কম হ'ক, দোলনকাল যে একই। কিন্তু দোলনকাল কি করে মাপা যেতে পারে?

এ হ'ল তিনশ বছর আগেকার কথা। ঘড়ি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। বালকটি ঝপ করে নিজের নাড়ীটা টিপে সময় নির্ধারণ করতে লাগল, আর দেখল—সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। দোলনের বিস্তার কম বেশি যাই হ'ক, দোলনকাল সমান।

এ-বালকটি গ্যালিলিও;—তখন সতের বছরের বালক গ্যালিলিও। সেদিন বিজ্ঞানের এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভেবে নিলেন যে, নাড়ীর স্পন্দন দিয়ে যদি দোলকের দোলনকাল মাপা যায়, তবে অন্যদিকে একটা দোলকের দোলনকাল লক্ষ্য করে নাড়ীর স্পন্দনকাল মাপা সম্ভব হবে। বেশিদিন গেল না, তিনি একটা ছোট যন্ত্র তৈরী করলেন, যা দিয়ে নাড়ির গতি মাপা সম্ভব হল। এই যন্ত্র ডাক্তারদের খুব কাজে লেগে গেল। গ্যালিলিওর নাম তখন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী গ্যালিলিও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম—গ্যালিলিও গ্যালিলি। তিনি যে বছর জন্মগ্রহণ করেন, সেই একই বছরে জন্মগ্রহণ করেন শেক্সপীয়র। তাঁর পিতা

ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও গণিতজ্ঞ। কিন্তু এসব চর্চায় পয়সা নেই ভেবে তিনি ছেলেকে কাপড়ের ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিলেন।

গ্যালিলিও দুদিনেই দেখলেন, সে কাজ তাঁর নয়। তিনি পিতাকে বুঝিয়ে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্র, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে গেলেন। অল্পকালের মধ্যে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ বলে গ্যালিলিও প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

বহু শতাব্দী আগে অ্যারিস্টটল বিজ্ঞানের যে সব তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, নির্বিচারে লোকে সে-সব এতদিন মেনে আসছিল। গ্যালিলিও বললেন খুব বড় কথা—ও সবের প্রত্যেক কথা যাচাই করে দেখতে হবে।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, একটা একশ পাউন্ডের ওজন ও এক পাউন্ডের একটা ওজন ওপর থেকে ছেড়ে দাও। একশ পাউন্ডের ওজন একশ গুণ দ্রুত পড়বে। গ্যালিলিও বললেন, বাজে কথা, তারা একই সঙ্গে পড়বে।

১৫৯৯ সালে একদিন সকালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা বহু দর্শক সহ ও বিখ্যাত আনত মিনারের পাদদেশে উপস্থিত হলেন। গ্যালিলিও মিনারের উপর উঠলেন। আর সেখান থেকে একটা ছোট বল ও আর তার থেকে একশগুণ ভারী একটা বড় বল একসঙ্গে ছাড়লেন। প্রত্যেকেই দেখলেন যে, বল দুটি একই সঙ্গে মাটিতে পড়ল, মাটিতে আঘাত করার শব্দও তারা শুনলেন। এতদিন ধরে মানুষ যে ধারণা করে আসছিল, সেই ধারণার অবসান হল চাক্ষুস প্রমাণে। বিজ্ঞান সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিবাদ করল সেই ধারণার।

কিন্তু নিজেদের চোখ-কান যাই থাকুক—আমাদের বিশ্বাস! তা কী ছেড়ে দেব? এইসব বলাবলি করতে করতে সবাই বাড়ি ফিরলেন,—শাস্ত্রবাক্য অমান্য করা হবে না। গ্যালিলিওকে যে করেই হ'ক দাবিয়ে রাখা দরকার। এবার তারা করলেনও তাই।

পিসাতে তাঁর শত্রুর সংখ্যা বাড়তে লাগলে বাধ্য হয়ে তাঁকে এখানকার চাকরি ছাড়তে হ'ল। কিন্তু পাদুয়াতে তিনি এখানকার চেয়ে ভালো একটা চাকরি পেলেন। সেখানে তিনি অনেক বছর অধ্যাপনার কাজ করলেন। দেশময় ছড়িয়ে পড়ল তাঁর কথা।

১৬০৯ সালে যখন তিনি একবার ভেনিসে গিয়েছিলেন, শুনলেন লিপারেস নামে এক চশমা বিক্রেতা এক যন্ত্র তৈরী করেছেন, যা দিয়ে দূরের জিনিস কাছে দেখায়। লিপারেসের যন্ত্র দেখবার চেষ্টা না করেই গ্যালিলিও নিজে সেই রকমের একটা যন্ত্র তৈরীর কাজে লেগে গেলেন।

তৈরী হ'ল সেই যন্ত্র, নাম তার দূরবীণ!

এ দিয়ে দূরের জিনিস কাছে দেখায়। দূরবীণ দিয়ে গ্যালিলিও অনেক নতুন নক্ষত্র দেখলেন—খালি চোখে যাদের দেখা যায় না। দিন দিন তিনি যন্ত্রের উন্নতি সাধন করতে লাগলেন। একটা ভালো যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে গ্যালিলিও আনন্দে অধীর হয়ে গেলেন। এর আগে কোনদিন মানুষ যা দেখেনি, সে সব তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ল। চাঁদের ওই যে সব কালো কালো ছাপ আমরা দেখি, লোকে বলে চাঁদের কলঙ্ক, গ্যালিলিও দেখলেন, সেগুলো ওখানকার পর্বতশ্রেণী। মাঝে মাঝে গভীর গর্ত। পরিষ্কার রাত্রে দেখা যায়, সমস্ত আকাশ জুড়ে এধার থেকে ওধার অবধি আলোর একটা রেখা যেন চলে গেছে, একে বলা হয় ছায়াপথ, এও তিনি দেখলেন। তাঁর তৈরী দূরবীণ দিয়ে দেখে লক্ষ্য করলেন যে ওটা বৃহৎ সংখ্যক নক্ষত্রের সমষ্টি, আর কিছু নয়। সূর্যকে যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে—গ্যালিলিও তার দূরবীক্ষণে সুনিশ্চিতভাবে তা প্রমাণ করলেন।

বিভ্রান্ত হ'ল গ্যালিলিওর শত্রুরা। তারা চক্রান্ত করে তাঁকে

বিচারকদের সম্মুখে আনল তারা। অভিযোগ—শাস্ত্রে যা লেখা আছে তার বিরুদ্ধে তিনি প্রচার করেছেন।

নির্দিষ্ট একটা এলাকার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হল তাঁকে। অবরুদ্ধ অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়তে লাগল। তিনি বধির হলেন। শেষে দৃষ্টিশক্তি হারালেন। তাঁর শেষ জীবন কাটল রোমের কারাগারে, আর ফ্লোরেন্সের একটি জায়গায় নজরবন্দী অবস্থায়। এই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হল ১৬৪২ সালে, সেই সালেই জন্ম হল নিউটনের।

মেষপালকের আবিষ্কার

একশ বছর আগেও মানুষ তেলের আলো ছাড়া অন্য কোন আলোর কথা ভাবতে পারেনি।

আগুনের ব্যবহার আরম্ভের পর থেকে মানুষ নানাভাবে হাজার হাজার বছর ধরে আলো জ্বালার ব্যাপারের উন্নতি সাধন করে আসছে।

আজ বিজ্ঞানের যুগে আমরা তো বিজলী আলোর মধ্যে বাস করে অন্ধকারকে প্রায় ভুলেই গেছি। এককালের কিন্তু মানুষ অন্ধকারেই বাস করত।

বিজলী-আলো আবিষ্কারের পূর্বে যিনি গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে মানুষকে অবাক করে দিয়েছিলেন, তিনি হলেন স্কটল্যাণ্ড দেশের মানুষ। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন মেষপালক।

স্কটল্যাণ্ডের দেশের এক গরীব গ্রামবাসীর ছেলে তিনি। উইলিয়াম মার্ডক নামে তিনি পরিচিত।

মার্ডক লেখাপড়া শেখার কোন সুযোগ পাননি। তিনি গ্রামের মাঠে মাঠে মেষ চরিয়ে বেড়াতেন। আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেলনা তৈরী করে গ্রামবাসীদের অবাক করে দিতেন। মার্ডকের আর একটা অদ্ভুত খেয়াল ছিল—তিনি কয়লার আগুনের ধোঁয়া দেখতে ভালবাসতেন।

বড় হয়ে মার্ডক বার্মিংহাম নগরের একটি বড় কারখানায় শ্রমিকের কাজ নিলেন। কারখানায় ঢুকে ছোটোখাটো নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরী করে কারখানার আবিষ্কারে উন্নতি করতে লাগলেন। তাঁর এইসব আবিষ্কারের ফলে কারখানার মালিকপক্ষ তাঁকে ভালবাসতেন এবং মালিকদের সুনজরে পড়ায় ফলেই তাঁর চাকরিতে উন্নতি হতে লাগল।

এদিকে তাঁর কাজও বেড়ে গেল অনেক। তিনি নিত্য-নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে লোককে অবাক করে দিতে লাগলেন।

এখন তিনি কাজের অবসরে রাত্রিবেলায় বাড়িতে বসেও নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। কিন্তু তেলের বাতিতে যন্ত্রপাতি নিয়ে সূক্ষ্ম কাজ করার তো অসুবিধে। তিনিও ভীষণ অসুবিধা বোধ করতে লাগলেন। অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি নানা- ভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন তিনি তাঁর কাঁচা কয়লার গ্যাসের সাহায্যে এই অসুবিধা দূর করলেন।

ছোটবেলায় যখন তিনি কয়লা পুড়িয়ে খেলা করতেন, তখন তিনি দেখেছিলেন যে, কয়লার ধোঁয়ায় অনেক সময় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। সেই পথেই তিনি তাঁর আলোর সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে লাগলেন।

একদিন তিনি একটা কেটলির মধ্যে খানিকটা কাঁচা কয়লা দিয়ে কেটলির মুখ বন্ধ করে তা আগুনে পোড়াতে লাগলেন। কেটলির নল দিয়ে সেই কাঁচা কয়লার ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল। তারপর সেই ধোঁয়াকে একটি রবারের নলের সাহায্যে অন্য একটি বন্ধ পাত্রের সাথে যোগ করে দিলেন।

সেই বন্ধ পাত্রটির উপরের দিকে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র-বিশিষ্ট একটি ঠুলি বসিয়ে দিলেন। তখন সেই ঠুলির ছিদ্র দিয়ে প্রবল বেগে কাঁচা কয়লার ধোঁয়া বেরুতে লাগল।

মার্ডক তখন সেই ধোঁয়ার মুখে একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ধরামাত্র দপ করে জ্বলে উঠল। এতে সারা ঘরটি আলোকিত হয়ে উঠল উজ্জ্বল আলোকে।

পৃথিবীতে এই প্রথম আলো জ্বলল গ্যাসের।

প্রথমেই তিনি নিজের বাড়ীকে গ্যাসের আলোয় সুসজ্জিত করলেন। তারপর তাঁর কারখানার মালিকের বাড়িতে এই আলো জেবলে সবাইকে অবাক করে দিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি লণ্ডন শহরের প্রতিটি রাজপথ আলোকিত করে দিলেন গ্যাসের আলোকে।

এরপর থেকে গ্যাসের আলো যথেষ্ট উন্নতি সাধন করতে করতে একদিন সারা পৃথিবীতে ব্যবহার হতে লাগল। মানুষ এবার অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

দূর হল রাত্রিবেলা মানুষের কাজের অসুবিধা। মানুষ এবার দিনরাত সমান ভাবে কাজ করে করে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে লাগল বিপুলতর গতিতে, প্রবল উৎসাহে।

প্রথম সুতো তৈরীর কল

সেকালে ইংলন্ডে 'জেমস হারগ্রীভ্স' নামে একজন দুঃস্থ তাঁতী ছিলেন। তাঁতীর স্ত্রী রান্নাবান্না করে যে সময়টুকু পেতেন, সে-সময়টুকু সুতো কেটেই কাটাতেন।

একদিন সুতো কাটবার সময় হঠাৎ তাঁর চরকার টাকুটা খুলে মাটিতে পড়ে গেল। তাঁতী হারগ্রীভ্সও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, টাকুটা মাটিতে পড়ে গিয়েও লাট্টুর মত দিব্যি ঘুরছে। তাই না দেখে হারগ্রীভ্সের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি ভাবলেন, একটা টাকুর বদলে যদি অনেকগুলো টাকু একই অবস্থায় রাখা যায়, তাহলে তো সেগুলোকে একটা চাকার সাহায্যেই ঘোরানো যেতে পারে।

চিন্তা এল মাথায়—হারগ্রীভ্স ধৈর্যের সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। কয়েক বছর ধরে খেটে একটা কল তৈরী করলেন তিনি। সে কলে এক গাছা সুতোর বদলে দশ গাছা সুতো একসঙ্গে তৈরী করা সম্ভব হলো।

গ্রীভ্স তাঁর স্ত্রী জেনীর নাম অনুসারে সুতো তৈরীর সেই কলের নাম রাখলেন 'স্পীনিং জেনী'। আর এই 'স্পীনিং জেনী' হল প্রথম সুতো তৈরীর কল।

বিজ্ঞানবীর নিউটন

সে প্রায় অনেক বছর আগেকার কথা। একদিন এক ইংরাজ বৃদ্ধা তার জানালা দিয়ে দেখতে পেলে যে, পাশের বাড়ির বাগানে বসে এক বয়স্ক লোক সারাদিন কেবল বুদ্‌বুদ্‌ ওড়াচ্ছেন। দু'দিন চারদিন এরকম দেখে বৃদ্ধা ভাবলে, লোকটা নিশ্চয় পাগল —তা না হলে, কাজ নেই, কর্ম নেই, কেবল কচি খোকার মতো বুদ্‌বুদ্‌ নিয়ে খেলা ! এ আবার কোন্‌ দেশী আমোদ ?

বুড়ি তখন ব্যস্ত হয়ে থানায় গিয়ে খবর দিলে।

পুলিশ বুদ্‌বুদ্‌-ওড়ানো লোকটির খবর নিতে গিয়ে দেখলে, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং আইজাক নিউটন। তাঁর মতো অত বড় বিজ্ঞানবীর হাজার বছরে দ্বিতীয়টি পাওয়া দুষ্কর।

বুদ্‌বুদের গায়ে যে রামধেনুর মতো জমকালো রঙ দেখা যায়, নিউটন তখন তার কারণ অনুসন্ধান করছিলেন।

নিউটনের পরেও ইয়ং প্রভৃতি বড় বড় পন্ডিতেরা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে করতে বছরের পর বছর কাটালেন। আর তার ফলে আলোক জিনিসটা যে কী, এ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এল। দেখে সবার মনে কৌতূহলও জাগল তখন।

শুধু মেঘের গায়েই নয়, আলোকের রঙীন খেলা স্ফটিক পাথর বা কাঁচে যে করে ঝিকমিক করে, তা সকলেরই জানা। কিন্তু সাধারণের দেখায় আর বিজ্ঞানীর দেখায় যে অনেক তফাৎ।

নিউটন সেই রঙের মেলাকে নানারকমে খেলিয়ে দেখলেন, আসল ব্যাপারটা কি ? তারপর এই একই ব্যাপারের সন্ধান করে কত পণ্ডিত যে কত নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তার অন্ত নেই।

'বর্ণালিবীক্ষণ' (Spectroscope) যন্ত্রও তৈরী হল। যন্ত্রে সূর্যের আলোককে দেখায় যেন রামধেনুর ফিতা। সেই ফিতার

মধ্যে রঙের মালা কেমন করে সাজানো থাকে বিজ্ঞানীরা হাজার রকম উপায়ে তার পরীক্ষা করেছেন।

সূর্যের আলোককে বর্ণবীক্ষণে পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, সূর্যের ভিতরকার গোলকটা যেমন গরম তার বাইরে আগুনটা সে রকম গরম নয়।

বর্ণালিবীক্ষণ শুরু করেছিলেন নিউটন। প্রিজমের মধ্যে সূর্যের আলো প্রবিষ্ট করিয়ে তিনি এ-কাজ শুরু করেন। পরে জার্মান বিজ্ঞানী জে, ফ্রাউনহোফার এ-কাজের আরও উন্নতি করলেন। সূর্যের বর্ণালিতে যে রামধনুর সাতটি রঙের সমাবেশ দেখা যায়, আর তার উপরে টানা টানা যে কালো দাগ—সেগুলির ব্যাখ্যা করলেন বিজ্ঞানীরা বললেন,—এটা লোহার জ্যোতি, এটা হাইড্রোজেনের আলো, এটা গন্ধকের চিহ্ন, এটা অঙ্গারের রেখা, এটা ক্ষারের ধাতুর, এটা চুনের ধাতুর ইত্যাদি সব কত কিছু।

তারার আলোর রামধেনু ফলিয়ে তাঁরা বললেন, এই তারাটা গ্যাসের পিণ্ড, এই তারাটা জমাট আগুন। ঐ তারাটা বাষ্পে ঢাকা। এই সমস্ত সংকেত শিক্ষার মূলে রয়েছে আইজাক নিউটনের ঐ রামধেনু দেখবার কৌতূহল।

বিজ্ঞানবীর নিউটন তাঁর বাগানে বসে দেখলেন, গাছ থেকে একটা ফল মাটিতে পড়ল। ঘটনাটা নিতান্তই সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার ফলাফল বড় সামান্য নয়।

নিউটন ভাবতে বসলেন, ফলটা মাটিতে পড়ল কেন? জিনিস মাত্রই শূন্যে ছেড়ে দিলে মাটিতে পড়ে কেন? চারদিক জুড়ে এত প্রকাণ্ড আকাশ পড়ে আছে, তা ছেড়ে এই পৃথিবীর মাটির ওপরেই বা তাদের এত ঝোঁক কেন? ভাবতে ভাবতে তিনি মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি সিদ্ধান্ত

করলেন যে পৃথিবীটা তার আশেপাশের সমস্ত বস্তুকে টানে। কিন্তু শুধু কি পৃথিবীই টানে? চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র এদেরও কি সে শক্তি নেই? আর শুধু কাছের জিনিস সেই পৃথিবী টানে, অনেক দূর পর্যন্ত কি তার টান পেঁছায় না। ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্ত হল এই যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিসই প্রত্যেকটিকে আকর্ষণ করে। যত দূরে যাওয়া যায়, সে আকর্ষণ তত ক্ষীণ হয়ে আসে ক্রমশঃ। এই পৃথিবী যন্ত্রকে টানছে, যন্ত্রও পৃথিবীকে টানছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি মাটির ঢেলা, প্রত্যেকটি ধূলিকণা পর্যন্ত জগতের আর সমস্ত জিনিসকে আকর্ষণ করছে।

নিউটন প্রমাণ করে দেখালেন যে, এইভাবে পৃথিবী গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলেরই চলাফেরার ঠিকমতো হিসাব পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত বড় তত্ত্বের আবিষ্কার আর দ্বিতীয় হয়নি বললেও চলে। আর এখান থেকে সূত্রপাত হল আধুনিক বিজ্ঞানের।

লুই পাস্তুরের অবদান

লুই পাস্তুর। ইনি ফরাসী দেশের মানুষ। জীব বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর যা দান, তা বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। পাস্তুর যখন এই জীবাণুদের জগতে উঁকি মারলেন, তখন অনেক পরীক্ষিত সত্য এসে গিয়েছে তাঁর হাতে। তাঁর পথ চলতে অসুবিধা হল না।

প্রথমেই তাঁর সন্দেহ হল, কেবল জলের ভেতর নয়, ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গাতে নয়, ঐ জীবাণুরা লুকিয়ে আছে সর্বত্র। বিশেষত বাতাসের ভেতরে, ভাসমান অণু ধূলিকণার ভেতরে একটা কাঁচকুপী নিয়ে পরীক্ষা করে হাতে হাতে তার প্রমাণও পেয়ে গেলেন। কাঁচকুপীটিকে পাস্তুর প্রথমেই বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু পরে খোলা রাখবার পর দেখা গেল তা জীবাণু মুক্ত হল না। অথচ বাতাস রুদ্ধ করে রাখার ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে।

এইভাবে তিনি একটার পর একটা পরীক্ষা চালিয়ে গেলেন। দেখা গেল নীচের দিকে সমতল ভূমিতে জীবাণুরা খুব বেশী পরিমাণে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু যত উঁচুতে ওঠা যায়, দেখা যায় যে, ব্যাপারটি একেবারে ভিন্ন। সেখানে জীবাণুরা নেই বললেই চলে। উঁচু পাহাড়ের ওপর বারবার মাংসের ঝোলের পরীক্ষা চালিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজকে এই সত্য তিনি ভালো ভাবেই দেখিয়ে দিলেন।

এবার কয়েকটি মজার ঘটনা ঘটল।···

পাস্তুরের জন্মভূমি হল ফ্রান্স। এই ফ্রান্স বা ফরাসী দেশ মদের জন্য বিখ্যাত। এই দেশে বিরাট বিরাট আঙুরের বাগান

আছে। এই আঙুরের রস থেকে বানানো হয় মদ। এই মদ বানানোর কারবারে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা লিপ্ত ছিলেন। দেশ-দেশান্তরের হাটে হাটে বিক্রয় করে এরা দেশের জন্য প্রচুর পয়সা রোজগার করে আনতেন। সুতরাং এই মদ-শিল্পের উপর সকলেরই ছিল নজর।

সেবার মদ ব্যবসায়ীদের এই কারবারে বিরাট এক সংকট দেখা দিল। দেখা গেল আঙুরের গায়ে ঠিকমত ছাতা পড়ছে না। ঐ ছাতা না পড়লে 'ঈস্ট' ঠিকমত তৈরী হয় না। এবং 'ঈস্ট' না হলে মদ হবে কি করে? ব্যবসায়ীরা এই দৈব দুর্বিপাকে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। শেষবেশ কোন উপায় না পেয়ে তারা ধরল গিয়ে পাস্তুরকে। পাস্তুর তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় আসল রহস্যটি ধরে ফেললেন, দেখলেন 'ঈস্ট' মানে জীবাণুর মেলা।

আর ঐ জীবাণুকে বধ করতে আসছে আর একদল জীবাণু। এখন বিজ্ঞানী যাকে সাহায্য করবেন তারই হবে জিত। বিজ্ঞানী পাস্তুর সেবার বাঁচিয়ে দিলেন ঐ মদ-শিল্পের ব্যবসায়ীদের।

১৮৬৫-তে এই ফরাসীদেশেই দেখা দিল আবার সংকট। তবে এ সংকট আর মদে নয়, এবারে আক্রান্ত হল রেশম শিল্পে।

মারাত্মক পেবরিণ রোগে রেশমকীট মারা যেতে থাকলো দলে দলে। চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল! এখন কে বাঁচাবে? কে বাঁচাবে এই রেশমকীটদের? বলা বাহুল্য সেখানেও পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখা দিলেন পাস্তুর, রক্ষা পেল ফ্রান্সের রেশম শিল্প।

সুদীর্ঘ ছিয়াত্তর বছর বেঁচে ছিলেন পাস্তুর, তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকাল নানা রোমান্সে ভরা। তিনি জীবাণুদের জীবন থাকে নানাভাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত করে দিয়ে গেলেন—করলেন বিজ্ঞানী সমাজের গোচরীভূত।

পাস্তুরের পর তাঁরই পথ ধরে এগিয়ে এলেন আরেক বিজ্ঞানী, এঁর নাম রবার্ট কম্‌। জাতিতে ইনি ফরাসী নন, ইনি জার্মানী।

বয়সের দিক থেকে ইনি পাস্তুরের চেয়ে তেইশ বছরের ছোট। তবে পাস্তুরের মতনই ইনি পেয়েছিলেন সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল। সুতরাং জীবাণুদের খবর পাস্তুরের থেকে কম জানালেন না। বরং আরেক দিগন্ত খুলে দিলেন বলা যায়।

সেবার ফ্রান্স দেশে দেখা দিল দারুণ গোরু ভেড়ার মড়ক—অসুখ। অসুখের নাম হল 'অ্যানথ্রাস'। দলে দলে গোরু ভেড়া অ্যানথ্রাস রোগে মরতে থাকল। বিজ্ঞানী পাস্তুর মৃত পশুর রক্ত নিয়ে এসে রাখলেন তাঁর অণুবীক্ষণের তলায়। আর তারপর যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির। দেখলেন এর ভিতরে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে অসংখ্য জীবাণু। বিজ্ঞানীর আর বুঝতে দেরী হল না যে ঐ রোগের মূল কারা? পাস্তুরের সবচেয়ে বড় মানব কল্যাণ মূলক আবিষ্কার হল—জলাতঙ্ক রোগের টিকা। পৃথিবীর বহু মানুষকে তাঁর এই আবিষ্কার বাঁচিয়ে চলেছে পাগলা কুকুরের কামড় এর পরে যে রোগ—জলাতঙ্ক, তার হাত থেকে।

এইভাবে একে একে কল্যাণসাধিত হতে থাকল তাঁর আবিষ্কারে। তিনি আবিষ্কার করলেন 'অ্যানথ্রাস' রোগের টিকা। বেঁচে গেল গোরু ভেড়ার দল।

বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কার

বিখ্যাত বিজ্ঞান গবেষক, বলিন রোনান বলেছেন, মানুষের মনে বিজ্ঞান চেতনার দীপশিখা প্রথম জ্বলে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় দশহাজার বছর আগে, মধ্যপ্রাচ্যে। সেই সময় সভ্য মানুষ শুধু প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনেই নয়, নিছক জানার বা বোঝার আগেই নানা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করতে আরম্ভ করে। তার আগে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষ শিকার ও গৃহস্থালির প্রয়োজনে ফ্লিণ্ট পাথরের টুকরো ঘসে বানিয়েছিল তীর, ছুরি, হাতুড়ি ইত্যাদি।

উদভ্রান্ত সেই আদিম যুগে গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর মানুষের জীবনে যুগান্তর আনলো অগ্নি-আবিষ্কার আর কৃষিকর্ম প্রচলন। সেই সময় গড়ে উঠল ছোট ছোট গ্রাম। উদ্ভাবিত হল আদি কৃষি-যন্ত্র লাঙ্গল।

মানুষ ক্ষেতে জলসেচের জন্য তার বৈজ্ঞানিক বৃত্তিকে কাজে লাগাতে শিখলো। শস্য-সংরক্ষণ, ফসল থেকে আরো নানা প্রয়োজনের সামগ্রী [যেমন, কার্পাস থেকে সুতো] বানাতে শিখলো।

কুমোরেরা চাকা ঘুরিয়ে বানাতে শুরু করলো নানা ধরনের মাটির পাত্র। ঐ সময় বয়ন শিল্পেরও উদ্ভব ঘটে। ভারী জিনিস সহজে তোলার জন্য ঐ সময় মানুষ কপিকল, আলম্ব (Fulcrum) প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য নিতে শিখেছিল।

প্যাপিরাস জাতীয় নল খাগড়া থেকে মিশরের মানুষ প্রথম লিখনের উপযোগী কাগজ বানিয়ে জয়যুক্ত হলো। ইরাকের মানুষরা প্রথম চাকাযুক্ত গাড়ি বানিয়ে পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনে। প্রাচীন ভারতে সংখ্যা চিহ্নের বিশেষত "০" (শূন্য

চিহ্নের উদ্ভব মাপজোখ ও ওজন নির্ধারণে প্রাচীন মিশর, সুমের দেশ ও সিন্ধু সভ্যতার বিজ্ঞানীরা হয়েছিলেন অগ্রণী।

কয়েক হাজার বছর আগে চীনের বিজ্ঞানীরা অতি দ্রুত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ বিয়োগ করার উপযোগী গণকযন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। ঐ গণকযন্ত্র একালের ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটের যন্ত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

একালে যে ঘড়ি ছাড়া আমাদের এক মিনিটও চলে না, তেমন 'অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল' ক্লক প্রথম বানিয়েছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানীরা আজ থেকে প্রায় দু' হাজার বছর আগে।

বিজ্ঞানী সেসিবিয়াস (Ctsibios) বানিয়েছিলেন জল ঘড়ি। জল ধারণের বিশেষ বাষ্প-যন্ত্র চালিত ঘড়ি প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীন দেশে। প্রথম ছাপাখানা এবং কম্পাস-যন্ত্র ঐ দেশেরই আবিষ্কার।

এ সমস্ত সৃষ্টি হল খ্রীষ্ট জন্মের আগে। গ্রীসের মানুষগণ প্রথম পৃথিবী ও মহাকাশের মানচিত্র বানায়। প্রাণী-বিদ্যার ক্ষেত্রে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, স্থাপত্য-বিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীরা যে সব তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন, তা মানুষের জীবন-যাত্রাকে যথেষ্ট সহজ করে দেয়। জলস্রোতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রাচীন গ্রীস ও ইরাকের বিজ্ঞানীরা যথাক্রমে ওয়াটার মিল ও উইন্ড মিল বানিয়ে ছিলেন। সেখানে জল অথবা বাতাসের শক্তিতে চাকা ঘুরিয়ে মানুষ প্রথম শস্য মড়াই-এর কাজ শুরু করে।

দৈনন্দিন জীবনে মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে পূর্ণাঙ্গরূপে কাজে লাগালে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব ঘটে। এর পর থেকে ঊনবিংশ শতকে ঐ সময় মানুষ বাষ্পের শক্তিকে নানা কাজে ব্যবহার করতে শেখে।

এই শতকে আমরা জ্বালানী কয়লা ছাড়াও পেট্রোলিয়ম, প্রাকৃতিক গ্যাস, এমনকি পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগাতে পেরেছি।

বাষ্প শক্তি, প্রাকৃতিক গ্যাসের শক্তি, সর্বোপরি বিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটল গৃহস্থের ঘরে ঘরে। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আমাদের এক মিনিটও চলে না। আর ঐ মিনিটের হিসাব করার জন্য প্রয়োজন হয় সেই ছোট বড় ঘড়ির। তার কোনটা বা ইলেকট্রনিক, কোনটা বা স্বয়ংক্রিয়। বাষ্প শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের রান্না ঘরে 'প্রেসার কুকার' গৃহিণীদের কাজকে সহজ করে দেয়। তার সঙ্গে থাকে বৈদ্যুতিক বা গ্যাসের উনান, এমন কি সৌরচুল্লী।

বায়ো গ্যাসে গ্রামের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। রান্নার কাজ সহজ হয়। পরিবহন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান তো রীতিমত যুগান্তর এনেছে। রোগ নিরাময়েও তার ভূমিকা বড় নয়। আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে টি. ভি. ও ভি. ডি. ও, ভারতের গ্রামাঞ্চলেও পেঁছে গেছে। ঘরে ঘরে আমরা এখন দেখছি এশিয়াড্ কিংবা বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা। সৌরশক্তি চালিত পকেট ক্যালকুলেটার করে দিচ্ছে দুরূহ হিসাব-নিকাশ। গৃহস্থালির কাজে কত রকম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যে আমরা ব্যবহার করে থাকি, তার সঠিক হিসাব দেওয়া শক্ত। রান্নার জন্যে রয়েছে 'কুকিং বেজ', মসলা বাটার ও নানা রকম মশলা গুঁড়া করার যন্ত্র রয়েছে, বাসন ও কাপড় ধোয়ার যন্ত্র আছে।

এককথায় যন্ত্র বর্জিত জীবন-যাত্রা আর কল্পনা করা যায় না।

বিজ্ঞানের বিস্ময় কম্পিউটার

গ্রামভিত্তিক সমাজের স্থিতাবস্থাকে ভেঙে দিয়ে শিল্প-বিপ্লব মানবসমাজের গঠন ও প্রকৃতিতে এনে দিয়েছিল এক সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন।

পাট কল, কাপড়ের কল, বই ছাপার কল, কলের গান, বাষ্পীয় জাহাজ, বাষ্পীয় ইঞ্জিন—চারদিকে যন্ত্রের প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার শুরু, আজ মানুষের চোখে অবাক বিস্ময়। বিস্ময়ের প্রাথমিক ঘোর কাটার পর মানুষ নিজেকে, নিজের শক্তির সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করল কলকারখানা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান-গুলিতে।

এরপরের ইতিহাস যন্ত্রযুগের আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। আর এই পটভূমিতেই কম্পিউটারের অবিষ্কার ও বিকাশ।

আজকের দিনে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার-নির্ভর স্বয়ংক্রিয়তা একদিকে যেমন যন্ত্রের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে বহুগুণিত করে মানুষের কর্মদক্ষতাকে, উৎপন্ন ক্ষমতাকে বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও প্রয়োজনীয় হিসেব-নিকেশ জাতীয় গতানুগতিক কাজকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করে অনাবশ্যক মানসিক শ্রমকে ব্যবসায়িক অর্থে অনেক সহজ করে তুলেছে।

কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা আসে চার্লস ব্যারেজ পরিকল্পিত একটি যন্ত্রগণক থেকে (১৮৩৩)। নির্ভুল এবং দ্রুত গণনার প্রয়োজনীয়তা ব্যারেজকে এই পরিকল্পনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। ব্যারেজের এই পরিকল্পনা রূপায়িত হতে সময় লেগেছিল প্রায় এক শতাব্দী, কারণ তাঁর ভাবনার সঙ্গে সমসাময়িক প্রযুক্তিবিদ্যা তখন তাল মেলাতে পারেনি। ব্যারেজের আগে ও পরে যে ধরনের

যন্ত্রগণক প্রচলিত ছিল, সেগুলি স্বয়ংক্রিয় নয়—একেবারে একটির বেশী গণনা দুই-এর বেশী সংখ্যা একসঙ্গে ব্যবহার করা যেত না। প্রযুক্তিবিদ্যার, বিশেষত ইলেকট্রনিকসের অগ্রগতি ও বিকাশ কম্পিউটারের রূপায়ণকে সহজ করে তুলল।

১৯৪৬ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তৈরী হল প্রথম স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। এরপরের চল্লিশ বছর কম্পিউটারের গঠন ও প্রকৃতি অত্যন্ত দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে। এর প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে বহুলাংশে। ইলেকট্রনিক শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কম্পিউটার হয়েছে অনেক সহজলভ্য। এখন বিজ্ঞানীর গবেষণাগার ছেড়ে সামাজিক জীবনে তার প্রতিষ্ঠা। কম্পিউটারের ক্রিয়াকলাপ একদিক থেকে মানুষের মগজের সঙ্গে তুলনীয়। মানুষ তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য ও সুসংঘবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখে তার স্মৃতিতে। এর উপর নির্ভর করে সে যে-কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে। কম্পিউটারের একটি স্মৃতি ভাণ্ডার আছে যেখানে দু'টি জিনিস সংরক্ষিত হয়। প্রথম কোন একটি বিশেষ সমস্যা-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যটাকে নিয়ে কম্পিউটার কাজ করে। দ্বিতীয়, সেই বিশেষ সমস্যা সমাধানের একটা ক্রম-বিন্যস্ত পদ্ধতি, যে ক্রম-বিন্যাস অনুযায়ী সে কাজ করে। সুতরাং একটি বিশেষ সমস্যা কম্পিউটার তখনই সমাধান করতে পারে, যখন তার স্মৃতিতে কি নিয়ে কাজ হবে এই দুটি বিষয়ই থাকবে।

প্রথমটাকে বলা হয় তথ্য (Data) দ্বিতীয়টিকে বলা হয় প্রোগ্রাম (Programme) এবং এই বিষয়টিকে বলা হয় কম্পিউটার সংকট। অন্যান্য যন্ত্রের মতো কম্পিউটারের একটা হার্ডওয়ার বা যান্ত্রিক কাঠামো ও গঠন আছে বা যন্ত্রটির ক্রিয়াকলাপের নির্ধারণ আছে।

কিন্তু কম্পিউটারের স্বাতন্ত্র্য হল, তথ্য ও প্রোগ্রামের রদবদল ঘটিয়ে একই কম্পিউটারকে নিয়ে অন্যান্য কাজ করানো যায়। কম্পিউটারের প্রয়োগ বিধির মূল কারণ চারটি ঃ এক, অত্যন্ত দ্রুত গণনা করতে পারে। দুই, পরিমাণ তথ্যকে সুসংঘবদ্ধভাবে সংস্করণ করার ক্ষমতা। তিন, ভ্রম শূন্যতা এবং চার, তথ্য ও প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি—অর্থাৎ ঐ চারটি বৈশিষ্ট্যকে যথার্থ ভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা। তাই কম্পিউটার ব্যবহার আজ বিচিত্র পথ ধরে এগিয়ে চলেছে।

মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপকথার গল্পে এক মজার রাজপুরীর কথা বলা আছে। সে ভারী মজার। সে পুরীতে আছে হাতীশালে হাতী, আছে ঘোড়াশালে ঘোড়া। কেউবা দেউড়িতে পাহারাওলারা। ঐ দীর্ঘদেহী পাহারাওলাদের কারো হাতে বর্শা, কারো হাতে লাঠি, আবার কারো হাতে বল্লম তরবারি—এ সবই দেখতে ভালো। কিন্তু মজা ওখানে নয়। মজা হল এই যে, এরা কেউই জেগে নেই, সবাই আছে ঘুমিয়ে। ঐ রাজপুরী আসলে ঘুমের রাজপুরী। ঘুমের একটা পাতলা চাদরে, গোটা দেশটা মোড়া। তাই ওখানে সব কিছু ছিল, আবার কিছুই ছিল না।

ঐ ঘুমন্ত রাজপুরী কি জেগে উঠবে না? উঠবে। তাকে জাগাতে হবে। আর এই জাগানোর কাজটি যিনি করতে পারেন, তিনি হলেন রাজপুত্তুর। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সেই রাজপুত্র একদিন আসবেন। তিনি এসে ঘুমন্ত রাজপুরীকে জাগাবেন।

সকলের বিশ্বাস হবে কিনা জানি না কিন্তু রাখালদাসের এ কথাটি প্রায়ই মনে হত। না, রাখালদাস কোন রাজপুত্তুর নন, পক্ষীরাজ ঘোড়া ত দূরের কথা, তার এমন কোন দোসর প্রাণী নেই, যে তাঁর কথা শোনে। ডাল-ভাত খাওয়া নিতান্তই এক সাদামাটা মানুষ তিনি। এই ভারতেরই ছেলে। তার ওপর বাঙালী। নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুরে দেশ। সুস্থ সবল পুরুষ। তবু, কী আশ্চর্য, স্বপ্ন দেখতে তিনি খুব ভালবাসতেন। আর সে স্বপ্ন যদি রূপকথার ঐ ঘুমন্ত রাজপুরীর স্বপ্ন হয়, তবে তো কথাই নেই।

যাই হোক এ রকম স্বপ্নকে একটা বুকে চেপে রেখে সেবার রাখালদাসকে যেতে হয়েছিল সিন্ধুপ্রদেশে। খুঁজে বেড়ালেন

সিন্ধুনদের তীরে তীরে। ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন তিনি। আর পুরাতত্ত্বের ব্যাপারে ছিল প্রবল উৎসাহ।

বৈদিকযুগের শিল্প নিদর্শন যদি পাওয়া যায় সেই রকম একটা লক্ষ্য নিয়ে গিয়েছিলেন রাখালদাস। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এ সবেরই সন্ধান নিচ্ছিলেন তিনি। এলেন নারাবানা দরজায়। এখানে এসে একটা ঢিবির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কি বিরাট ঢিবি। একটা তামার তৈরী অস্ত্র হঠাৎ তিনি খুঁজে পেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানী মনে রাখালদাস ভাবলেন। এ কার অস্ত্র? কাদের? ঐ অঞ্চলের কয়েকজনকে প্রশ্ন করে তিনি জানলেন ঐ স্থানের নাম কী?

'মহেঞ্জোদাড়ো।

এ আবার কী নাম?

এইসব জিজ্ঞাসা তাঁকে আবিষ্ট করল। ওখানকার প্রাচীন লোকেরা তাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। 'মহেঞ্জোদাড়ো' কথাটির অর্থ 'মৃতের ভূমি' বা মৃতের দেশ। এই বিচিত্র নাম থেকেই রাখালদাস পেলেন রহস্যের আভাস।

রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীর যে ছবিটা তিনি প্রায়ই দেখতেন, সেই রকম একটা ঘুমন্ত দেশের ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। এখানকার মাটিতে পেলেন পুরানো দিনের গল্প।

এরপর যা করবার তাই করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে পুরাতত্ত্বের বিজ্ঞানের প্রধান কর্তা জন মার্শালকে চিঠি লিখলেন। হাজির হলেন তাঁর কাছে। মার্শাল সাহেব রাখালদাসকে খুব স্নেহ করতেন। তার সব কথা শুনে বললেন, তাঁর হাতের সেই অস্ত্রটি তুলে নিলেন। আর নিলেন সেই মৃত দেশের ঠিকানা।

সাহেব বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন। উনি পাইপে তামাক খেতেন। পাইপ টানতে টানতে অনেকক্ষণ পায়চারি করলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তোমাকেই এর সব দায়িত্ব নিতে হবে, ইয়ং-ম্যান ! ওখানকার মাটির ঢাকনা খুলে ওই মৃতের দেশের খবর এখনকার জীবন্ত লোকদের সামনে তোমাকেই তুলে ধরতে হবে।

'আমাকে !' রাখালদাস বিস্ময়ে বললেন। সাহেব পাইপ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমাদের ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব তোমার ওপর অনেক আশা রাখে। তুমি আজই রওনা হয়ে যাও। আর যাবার আগে' সাহেব একটু থেমে বললেন, 'হরপ্পাটা' একটু দেখে যেও।

'হরপ্পা'। সে আরেক রহস্যময়ী নগরী। সে আরেক মৃতের শহর। তার আবিষ্কারও ভারি মজার। সে ১৮৫৬ সালের কথা। করাচি থেকে পঞ্জাবের লাহোর শহরের দিকে তখন রেললাইন পাতার কাজ চলছে। সিপাইদের লড়াই তখনো আরম্ভ হয়নি। সাহেবরা দাঁড়িয়ে থেকে পাতাচ্ছেন রেললাইন। এই লাইন পাততে হলে অনেক শক্ত ইট আর পাথরের কুচি দরকার। এঁরা হন্যে হয়ে এসব খুঁজছিলেন। এমন সময় কে-না-কে যেন সাহেবদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন ঐ রকম দুটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ।

সাহেবরাও ঐ ধ্বংসস্তূপকে নিয়ে নিজেদের কাজ গোছালেন। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন দুটি নগরকে এঁরা যে চিরতরে নষ্ট করে ফেললেন তা এঁরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না। বিলম্ব হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক জেনারেল বাকিং হোমের কাছে পেঁছুল গিয়ে এই সংবাদ। তিনি দৌড়ে এলেন। দেখলেন। তারপর তাঁর অভিজ্ঞতার কথা পেঁছে দিলেন জন মার্শালের দপ্তরে। মার্শাল সাহেব দেখেশুনে 'হরপ্পার' মাটি খোঁড়ার কাজ অনুমোদন করলেন। দয়ারাম সাহানী নামে এক দেশীয় লোকের ওপর দায়িত্ব দিলেন জন মার্শাল।

'হরপ্পা' বলে সাহেব এই নগরীর প্রত্নতাত্ত্বিক তাৎপর্যের ইংগিত দিলেন।

১৯২১ আরম্ভ হয়েছিল ঐ কাজ। পরের বছর আরম্ভ হল মৃতের নগরী 'মহেঞ্জোদাড়ো'র অবগুণ্ঠন মোচনের কাজ। তাবু পড়ল বড়ো বড়ো। অনেক তাঁবু। অনেক জায়গাটির ভৌগোলিক অবস্থান বড়োই আশ্চর্যের। পশ্চিমে বেলুচিস্থান। মরুভূমি। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে হা-হা করে ছুটে আসে গরম বাতাস। শীতে কিন্তু হিমেল হাওয়া।

রাখালদাসের কাজ কিন্তু সারা বছরই চলে। সকাল থেকে সন্ধ্যে। সন্ধ্যের পর শ্রমিকদের বিশ্রাম। এরা ভারি সরল। গ্রীষ্মের দিনে খোলা আকাশের তলায় খাটিয়া টেনে শুয়ে থাকে। শীতকালে খড়কুটো যোগাড় করে আগুন জ্বালে। জটলা করে, রুটি সেঁকে। দেশ-গাঁয়ের গল্প করে।

আর রাখালদাসের তাঁবুতে নীল আলো জ্বলে। স্বপ্নিল আলো। মাটির তলায় প্রতিদিনই যে প্রত্নবস্তুগুলো পান, সেগুলো নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করেন। অবাক বিস্ময়ে দেখেন। আর এগুলো দেখতে দেখতে রূপকথার রাজপুত্তের মত তিনি সেই ঘুমন্ত নগরীর দেশে চলে যান। চলে যান হাজার হাজার বছরের একটি প্রাচীন নগরীতে। চারিদিকের রহস্যময়তা ঘিরে ধরে।

শহরের পশ্চিমে ঢিবি। বেশ উঁচু ঢিবি। ঐ টিলার ওপর দুর্গ। বন্যা প্রতিরোধের আর শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ দুটি কাজই এই টিলা করেছে।

নগরের রাজপথ আড়াআড়ি ভাবে উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব-পশ্চিমে ছড়ানো। এপথে রাখালদাস অনেক হেঁটেছেন—অনেক। ঐ আড়াআড়ি পথের থেকে বেরিয়ে গেছে অসংখ্য অলিগলি। এগুলির গায়ে গায়ে এবং বড়ো রাস্তার দু'ধারে বাড়ি আর বাড়ি। ভারি সুন্দর সুন্দর বাড়ি। এদের আবার একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একালে বাড়ির সদর দরজা সদর পথেই থাকে, এদের

কিন্তু তা নয়। বাড়িগুলো সদর রাস্তার ধার থেকে উঠে গেছে বটে, সদর দরজা কিন্তু সব গলির দিকে।

ঐ পথ দিয়ে নিয়মিত রাখালদাস বাড়ী ঢুকেছেন। নিয়মিত। দো-তলায় ওঠবার ভাঙা সিঁড়ি যেদিন আবিষ্কৃত হল, সেদিন রাখালদাস একটা দিনের কথা তাঁর মনে হলো।

তাঁর মনে হল—'ঠিক ঐ রকম একটা দোতলা বাড়িতে কয়েক হাজার বছর আগেকার এক অপরাহ্নে আমি উঠে গিয়েছিলাম। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য তখন ডুবে যাচ্ছে। দো-তলায় উঠে দেখলাম, একটি মেয়ে গান গাইছে। সান্ধ্য মেঘস্তূপের ওপর তখন এক আশ্চর্য লাল আভা পড়েছে। সে আজ কতকাল হল ......দেখেছি সুন্দর সুন্দর সাজানো বাগান। আর থরে থরে সাজানো মনোহারী দ্রব্য। পথের ধারে ধারে আলোক স্তম্ভ। সন্ধ্যার লগ্নেই জ্বলে ওঠে আলোকমালা। দেশ-বিদেশের ব্যাপারীরা আসেন। বিচিত্র পোশাকের এই সওদাগরের দেখা আমি অনেক দিন পেয়েছি।'

[রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের পাষাণের কথা থেকে]

ন' বছর চলল খোঁড়ার কাজ। পুরো ন'বছর। বাইশ সাল থেকে একত্রিশ সাল পর্যন্ত। ঐ ন'বছরের প্রতিটি দিন ছিল তাঁর উত্তেজনা চঞ্চল। ছোট তাঁবুর ভেতর ক্ষীণদীপালোকে পাঠিয়ে দিতেন সেই পাঁচ হাজার বছর আগের পুরানো শহরটিতে।

রাখালদাস আবিষ্কার করলেন 'মহেঞ্জোদাড়ো'র পুরানো স্মৃতিকে, যে একদিন গোটা শহরটি নেমে গিয়েছিল মাটির তলায়। সেই মাটির তলা থেকে রাখালদাস ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিল, অতীতে ছিল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের পদচিহ্ন।

ঘড়ি আবিষ্কারের কথা

ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। এক সন্ন্যাসী মঠে বাস করতেন। নাম তার আগস্টিন। আগস্টিন-এর কাজ ছিল রোজ মাঝরাতে তিন ঘণ্টা পরে পরে উঠে ঘণ্টা বাজানো।

মঠের সন্ন্যাসীরা সেই ঘণ্টার আওয়াজ শুনে জেগে উঠতেন এবং প্রার্থনায় যোগ দিতেন।

তখন তো ঘড়ি ছিল না। কাজেই ঠিক সময় ঘণ্টা বাজানোর জন্য এক অভিনব উপায় বের করেছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় তিনি একটা স্তবের বই পড়া শুরু করেন। বইটি পড়তেন একই রকম গতিতে।

কখনও তাড়াতাড়ি আবার কখনও বা আস্তে নয়।

এমনি ভাবে বইয়ের নির্দিষ্ট অধ্যায় যখন শেষ হ'তো তখনি তিনি ঘণ্টা বাজাতেন।

কিন্তু সময় ঠিক করার এটা যে অভ্রান্ত উপায় নয়, তা তো বুঝতেই পারছ। কারণ, আগস্টিন যে রোজ একই গতিতে বইটি পড়তে পারবেন এমন তো সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ?

মানুষের তখন নজর পড়ল সূর্যদেবের ওপর। আকাশের ঐ যে সূর্য—এতো রোজ একই সময়ে ওঠে আর ডোবে। ওটা দেখে সময় ঠিক করার কথা মানুষের মনে হল।

কাজেই সময় নির্দেশের জন্যে তখন থেকে ভোরবেলা, দুপুর-বেলা, সন্ধ্যাবেলা, রাত্রিবেলা প্রভৃতি শব্দগুলোর প্রচলন হল।

কিন্তু এই শব্দগুলিতে তো ঠিক সময় বেরোয় না। সময় সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দেয় মাত্র।

তবে ?

সূর্যকে ছেড়ে মানুষ এবার সেই ছায়ার স্মরণ নিল। খোলা জায়গায় একটি খুঁটি পোঁতা হল। সূর্য উঠতেই ঐ খুঁটির ছায়া পড়ল মাটিতে।

সকালে লম্বা ছায়া। ক্রমশ তা ছোট হতে হতে দুপুরে হল খুব ছোট। তারপর আবার ছায়া লম্বা হওয়ার পালা। বিকালে খুব লম্বা ছায়া। তখনকার মানুষ ঐ ছায়া পা দিয়ে মেপে সময় ঠিক করতো।

সময় বোঝাতে মানুষ তখন বলতো ঃ—পাঁচ পা লম্বা বা আট পা লম্বা ছায়া ইত্যাদি। ছায়া সৃষ্টির ঐ খুঁটিটাকে গ্রীকরা বলতো সোমন। সোমন ছিল তখন সময় মাপার যন্ত্র।

সেকালে সময় মাপার জন্য আমাদের দেশের ফকিররা একটা অভিনব লাঠি ব্যবহার করতেন, ছয়কোণা লাঠি। তার মাথার দিকে প্রত্যেক কোণে একটা করে গর্ত। ঐ গর্তে লাগানো একটা পেরেক। সময় জানবার দরকার হলেই ফকির লাঠিটাকে খাড়াভাবে ধরতেন। তখন পেরেকের ছায়া পড়তো লাঠির গায়ে। লাঠির গায়ে থাকতো দাগ কাটা। পেরেকের ছায়া ক'টা পর্যন্ত দাগে পড়েছে—তাই দেখে সময় ঠিক করতেন ফকির। রোদ্দুর না থাকলে অবশ্য এর দ্বারা সময় ঠিক করা যেতো না।

বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্য বিভিন্ন গতিতে ঘোরে। তাই তার ছায়াও হয় বিভিন্ন ধরনের। গ্রীষ্মের দুপুরে পেরেকের যে ছায়া পড়বে লাঠির গায়ে, শীতের দুপুরের ছায়ার চেয়ে তার দৈর্ঘ্য হবে কম। ছয় ঋতুর জন্যে লাঠিতে রাখা হতো ছয়টি কোণ।

সোমন আর এই ফকিরের লাঠি—দুই-ই ছায়াবাহি।

হাজার হাজার বছর আগে ব্যাবিলন দেশের লোকেরা আবার জল দিয়ে সময় মাপতো। তারা একট চৌবাচ্চাকে জল দিয়ে ভর্তি করতো। তারপর চৌবাচ্চার তলাকার ছোট ফুটোটি দিতো খুলে। আস্তে আস্তে ঐ ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে যেতো। তখন তারা আবার চৌবাচ্চাটিতে জল ভরতো। প্রতি বারই চৌবাচ্চাটি খালি হতে একই সময় লাগতো। এই হল প্রথম জলঘড়ি।

জলঘড়ির উন্নত রূপ দেখা দিল চীনদেশে। চীনারা মস্ত বড় একটা চৌবাচ্চা তৈরী করতো। ঐ চৌবাচ্চার জল সবটা বেরুতে পুরো একটা দিন সময় লাগতো, কাজেই চৌবাচ্চা খালি হলেই বোঝা যেত—একদিন কেটে গেছে।

কিন্তু ঘণ্টা মাপা হবে কি ভাবে?

সেইজন্যে চীনারা চৌবাচ্চার গায়ে চব্বিশটা দাগ কাটতো। সব দাগের মাঝের ফাঁক সমান নয়। উপরের দিকের দাগগুলোর মাঝের ফাঁক বেশি, আর নীচের দিকের দাগগুলোর মাঝের ফাঁক ক্রমশই কম।

চৌবাচ্চা যখন জলে ভরা তখন জলের চাপ সবচেয়ে বেশী। তারপর জল বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে তার চাপ থাকে কমতে। চৌবাচ্চার তলাগুলোর ফুটো খুলে দিলে জল বেরুতে থাকে। জলের তলে এক এক দাগ থাকে এক ঘণ্টার। জল দড়ির সাহায্যে এমন ভাবে দিন ও ঘণ্টা মাপা হতো সেকালে।

সময় উদ্ধার ঠিক করার আর একটা উপায় ছিল সেকালে। জ্বলন্ত মোমবাতির মোম কতটা গলেছে, তাই দেখে লোক সময় ঠিক করতো! একে বলা হত বাতি ঘড়ি। বাতি ঘড়ি যে নির্ভুল সময় দেয় না—তা তো বোঝা যায়। কারণ, মোমবাতি তো সব সময় সমান ভাবে জ্বলে না। যে তাই দেখে সময় বোঝা যাবে।

এছাড়া সেকালেও ছিল বালি ঘড়ি, দুধ ঘড়ি ও জীবন্ত ঘড়ির চলন। জীবন্ত ঘড়ি বলতে কাকে বোঝায়? মোরগকে।

যাই হোক কলের ঘড়ির আবিষ্ক্যরের আগে মানুষ যুগ যুগ ধরে বুদ্ধি খাটিয়ে বিভিন্ন ধরনের সময় মাপার উপায় আবিষ্কার করে এসেছে।

সব শেষে মানুষ আবিষ্কার করেছে—কলের ঘড়ি।

একালের উন্নত ঘড়ি······এর সাহায্যে কত নির্ভুলভাবে যে সময় মাপা যায়—তা তো তোমরা জানই।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অটোমেশন

যে অদম্য কর্মশক্তি এককালে আমাদের প্রধান অবলম্বন ছিল, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্মশক্তির বিকল্প হয়ে পড়েছে যন্ত্রশক্তি। তাই কর্মশক্তি আমাদের যন্ত্রশক্তি দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত ও প্রবাহিত হচ্ছে। মানবকল্যাণে বিজ্ঞান তাই মঙ্গল হস্তের স্পর্শে ধীরে ধীরে মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে বিরাম, বিনোদন এবং গতি। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কর্মশক্তির মূল্য হ্রাস পেয়েছে। মানুষ আপন কল্যাণ কামনায় বুদ্ধি এবং নৈপুণ্যের দ্বারা সৃষ্টি করেছে যন্ত্র। কিন্তু সেই যন্ত্র আজ মানবের উন্মেষশালিনী শক্তিতে এতই উন্নত যে, যেখানে যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, যেখানে মানুষ হতে পারবে অকিঞ্চিৎকর নগণ্য! অদম্য কর্মশক্তির বিকল্প এই যন্ত্রশক্তি সাধারণভাবে 'অটোমেশন' নামে খ্যাত।

'অটোমেশন' আধুনিক কালের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। আধুনিক পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও প্রসারের এক উজ্জ্বল দিক চিহ্ন। শব্দটি সাম্প্রতিক কালের। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এই শব্দটি বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে।

অটোমেশন কি?

অটোমেশন হল স্বশাসিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, যান্ত্রিক প্রয়োগে বা আরও বিশ্লেষণে ইলেকট্রনিকস্ কিংবা কম্পিউটার জনিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে কোন ক্ষেত্রে মানব শক্তির ব্যবহারকে সীমিত করায় অটোমেশন। মানুষের হাতেই এর কর্মশক্তির বিকাশ। মানুষের হাতেই এর পরিচালন ভার। কিন্তু অনেক মানুষের কর্মশক্তির ফল অটোমেশনের সাহায্যে নিয়ে আসা সম্ভব এবং তা অতি অল্প সময়ে। আজ এই কর্মশক্তির বিকল্প হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

অথচ এই যন্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেই। ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের পরে শ্রমশক্তির প্রয়োগ সীমিত করে যন্ত্রশক্তি ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। প্রথমে সে এসেছিল মানুষের কাজে সাহায্য করার জন্য। এক সময়ে দেখা গেল, সেই মানুষের শ্রমশক্তিই যন্ত্রের কাছে মূল্যহীন হয়ে এসেছে। তারপর বিজ্ঞান এসে পেঁছাল ইলেকট্রনিকসের যুগে। তখন যন্ত্রের কৌশল এতদূর উন্নীত হল যে, মানুষ তাকে পরিচালনা করল বটে, কিন্তু আরোপিত কর্মে সে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠল। আজ বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অটোমেশনের জোয়ার এসেছে। মানুষের হাতে কলমে যে কাজ করতে হয়, তার দায়িত্ব ভার পড়েছে অটোমেশনের উপর। অটোমেশনের কাজ শুধু বৃহৎ প্রতিষ্ঠান-গুলির নানা তথ্যের হিসাব-নিকাশ, তথ্য সংস্করণ বা বিশ্লেষণ নয়, শিল্পে অটোমেশনের ব্যবহার দেখা গিয়েছে বর্তমানে নানা দিক দিয়ে। ইলেকট্রনিকস্ শিল্প আজ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত যে অটোমেশনে তার বিচিত্র প্রয়োগ দেখে বিস্মিত হতে হয়। গাড়িতে ওয়েল-ডিংয়ের কাজে ভূমিকা আজ ডিলিং বা কাটিংয়ের কাজেও এদের লাগানো হয়। কদাচিৎ মেসিন থেকে জিনিসপত্র তোলারও এত সক্রিয়তা লক্ষণীয়। এসব ক্ষেত্রে অটোমেশন এসেছে যন্ত্র মানুষের রূপ নিয়ে।

কিন্তু যন্ত্রদানব বা রোবট মানুষের প্রতিরূপ নয়। যখন যেমন প্রয়োজন, সেইভাবে তার রূপ দেওয়া হয়। এইসব রোবটের প্রয়োগ হচ্ছে কলকারখানার বিবিধ কাজে, যেখানে উত্তাপে, তেজষ্ক্রিয়তায়, জটিলতার ক্ষেত্রে মানুষ সহজ ও স্বচ্ছন্দ ও তৎপর নয় বা যেখানে মন্থর একেবারে যান্ত্রিক বা গতানুগতিক।

অটোমেশন প্রয়োগে নথিপত্র সংরক্ষণ, এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা বরং তা বৈজ্ঞানিকভাবে।

এলিয়াস হাউসের সেলাই কল

এলিয়াম হাউস আমেরিকার লোক। তাঁর ছেলেবেলার শখ ছিল তিনি 'সেলাইয়ের কল' চালাবেন।

সে সময়ে সেলাইয়ের কাজ সমস্তই হাতে করতে হত। কিন্তু হাউস ভাবলেন, এত রকম কাজ কলে হচ্ছে, আর সেলাই হতে পারবে না কেন? তিনি অনেকদিন ধরে এই বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু সূঁচসুদ্ধ সুতোটাকে কাপড়ের ভেতর দিয়ে পারাপার করাতে গিয়ে মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। নানা রকম ফন্দী খাটিয়েও এই কাজটিকে তিনি কলে লাগাতে পারলেন না।

তখন একদিন রাত্রে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন 'এখনই আমাকে সেলাইয়ের কল বানিয়ে দাও, যদি না দাও তো তোমায় মেরে ফেলব।

স্বপ্নের মধ্যে সেলাইয়ের কল বানানো গেল না।

রাজা আদেশ দিলেন 'মারো একে'।

তখন কতকগুলো লোক বল্লম দিয়ে মারতে এল।

হাউস দেখতে পেলেন, সেই বল্লমের মুখের ফলকের মাথায় একটা ফুটো!

তৎক্ষণাৎ হাউসের ঘুম ভেঙে গেল।

তিনি উঠে বসতেই সর্বপ্রথমে তাঁর মনে হল বলমের মুখের কাছের ফুটোটির কথা।

তিনি ভাবলেন, এই তো ঠিক হয়েছে। কলের সূঁচে পিছনে সুতো না দিয়ে এ রকম মুখের কাছে সুতো দিলেই তো কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

শেষকালে পরীক্ষা করে দেখা গেল সেলাইয়েরকল করবার পক্ষে আর কোন বাঁধা রইল না। এই হল সেলাই কলের ইতিহাস।

আবিষ্কারক জন হাণ্টার

ডাক্তার জন হাণ্টার জাতিতে স্কট ছিলেন। ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে
তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং মারা যান ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, অস্ত্র চিকিৎসক, অস্থি বিশারদদের
মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

স্কটল্যাণ্ড দেশে তিনি তাঁর বাল্যকাল আনন্দে কাটিয়েছেন।
প্রথম জীবনে তিনি গ্লাসগো শহরের এক ছুতোরের দোকানে কাজ
করতেন। তারপর তিনি লণ্ডনে যান। নবীন অস্ত্র চিকিৎসকদের
শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর ভাইয়ের একটা অস্থিবিদ্যার স্কুল ছিল।
সেই স্কুলে তিনি অস্ত্রোপচার শিক্ষা করতে থাকেন। সেইখানেই
তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা ঠিক করেন। তিনি গভীর
মনোযোগ ও অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্রোপচারের কাজে আত্ম-
নিয়োগ করেন। অচিরেই তিনি অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন,
এবং তার উপর ভার দেওয়া হয় স্কুলের ছাত্রদের শিক্ষা দেবার।

ইতিমধ্যে মানবদেহ সম্বন্ধে সে সময়কার সকল জ্ঞান তিনি
সঞ্চয় করেন। উত্তর জীবনে শিক্ষাদানকালে তিনি অনেক নতুন
তথ্য আবিষ্কার করেন।

তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি একজন সুদক্ষ অস্ত্র চিকিৎসক,
অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক রূপে জীবনযাপন করেন।

মানব শরীর—অস্থি, পেশী, শিরা, উপশিরা সম্বন্ধে তিনি যে
কত নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন তা বর্ণনা করা যায় না।

অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে নব নব ধারা তিনি আবিষ্কার করেন,
এবং সে বিষয়ে তিনি শিক্ষাদান করেন। অসংখ্য প্রাণিদেহের
উপর অস্ত্রোপচার করে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এ সব

কারণে আজও জগতের সমস্ত অস্ত্র চিকিৎসকরা তার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন না।

পৃথিবীতে 'অস্ত্র চিকিৎসাবিদ্যার জনক' বলে কাউকে যদি অভিনন্দিত করা হয়—জন হাণ্টার ঐ অভিনন্দনের যোগ্য ব্যক্তি।

রুগ্ন ও আহত ব্যক্তিদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার জন্য তিনি অসংখ্য রকমের হাজার হাজার মৃত ও জীবিত প্রাণীর উপর পরীক্ষা করেন। অসংখ্য প্রাণীর জীবন ইতিহাস জানবার জন্য তিনি নানা পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গের দেহের উপরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে কুণ্ঠিত হন নি। একবার তিনি একটা কঠিন ব্যধির কাছে আত্মসমর্পণ করেন—শুধু সেই ব্যধির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে !

মানবদেহ সম্বন্ধে জ্ঞানলব্ধকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক।

বিদ্যুৎ প্রবাহের আবিষ্কার

একটা মরা ব্যাঙের নাচন থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহের আবিষ্কার হয়।

গ্যালভিন নামে এক ইটালিয়ান পণ্ডিত পরীক্ষার জন্য একটি ব্যাঙ কেটে একটা লোহার শলাকায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। খানিক পরে তাঁর স্ত্রী দেখেন, সেই মরা ব্যাঙের ঠ্যাংটা এক-একবার ঝুলে পড়ছে আর এক-একবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে।

তিনি যদি এটাকে ভূতুড়ে কাণ্ড ভেবে ভয়ে পালাতেন, তবে তাঁর আর বিদ্যুতের তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হত না।

কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জানবার জন্য তাঁর কৌতুহল জেগে উঠল।

তখন দেখা গেল, ঐ ব্যাঙের পায়ের নীচে একটুকরো তামা রয়েছে, তাতে যতবার পা ঠেকেছে ততবারই মরা ব্যাঙটা নেচে উঠেছে।

গ্যালভিনও খবর পেয়ে দেখতে এলেন ব্যাপারটা।

তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে ওটা বিদ্যুতেরই কাণ্ড। এখন এই যে শহরে শহরে বিদ্যুতের কারখানা রয়েছে, আর তাদের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে ঘরে ঘরে পাখা চলছে, আলো জ্বলছে, এর আবিষ্কারের ইতিহাস যদি লিখতে হয়, তবে তার মধ্যে ঐ ব্যাঙের গলপটারও উল্লেখ থাকবে।

জগদীশচন্দ্র বসুর নতুন তথ্য

বিশ্ব বিখ্যাত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার প্রসঙ্গে সুকুমার রায় বলেছেন ঃ—

"বন চাঁড়ালের গাছের পাতা আপনা আপনি কাঁপিতে থাকে। ইহা অনেকেই দেখিয়াছে। কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কৌতূহল ইহাতেই জাগিয়া উঠিল। তিনি যে কত রকম মেশিন খাটাইয়া কত রকম পরীক্ষা করিয়া এই পাতাকে নাচাইয়া দেখিয়াছেন, তাহার যদি খবর লওয়া যায় তবে বুঝিতে পারা যাইবে 'বৈজ্ঞানিকের 'দেখা' আর সাধারণ লোকের দেখার তফাত কি?'

জগদীশ চন্দ্র কলকাতার পড়া শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গেলেন। ইংলণ্ডে তিনি বড় বড় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলেন। এই সঙ্গলাভ এবং সুযোগ পেয়ে তাঁর উৎসাহ বেড়ে গেল। নতুন জিনিস আবিষ্কার করার নেশা তীব্র হয়ে উঠল তাঁর।

পড়া শেষ করে জগদীশচন্দ্র নিজ দেশে ফিরে এলেন। তারপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। সে সময় বিদেশী অধ্যাপকদের মাইনে ছিল দেশী অধ্যাপকদের চেয়ে বেশী। তা দেখে জগদীশ চন্দ্রের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি এরূপ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, এমনকি, তিন বছর বিনা বেতনে অধ্যাপনা করলেন। এ সময় তাঁকে অর্থাভাবে যথেষ্ট দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তবু তাঁর বিজ্ঞান সাধনায় ব্যাঘাত ঘটেনি। তিনি সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করে গবেষণাগারে বসে কঠোর সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র কেবল বিজ্ঞানীই ছিলেন না। তিনি স্বদেশ প্রেমিকও ছিলেন।

অবশ্য বিজ্ঞান ছিল তাঁর জীবন। তার জন্য তিনি নানাপ্রকার কষ্ট স্বীকার করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। অসীম ধৈর্য সহকারে

তিনি বিজ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন থেকে জগৎবাসীকে জানালেন তাঁর সাধনা- লব্ধ ধনের খবর।

তখন আমাদের দেশে কোন উন্নত ধরনের গবেষণাগার তৈরী হয়নি। এর জন্য তিনি বাড়িতে এবং কলেজে বসে নিজ হাতে তাঁর গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি তৈরী করেন।

তাঁর বহু কিছু আবিষ্কারের মধ্যে বিনা তারে সংবাদ পাঠান এবং গাছপালার জীবন আছে—এই দুই আবিষ্কার পৃথিবীকে তোলপাড় করে তোলে।

তিনি বিদ্যুতের দ্বারা এক কামরা থেকে অন্য কামরায় ঘণ্টা বাজালেন।

তা দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'গাছ-পালার অনুভূতি আছে। তারা সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে। মরবার আগে তারা কাঁদে।

প্রাণীদের মতো গাছপালা ঘুমায় ও জাগে। গাছপালায় জল দিলে গাছপালা বাড়ে আবার বিষ ক্রিয়ার ফলে গাছপালারও মৃত্যু ঘটে।

এই চমকপ্রদ আবিষ্কারের সংবাদ পেয়ে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে তাঁর গবেষণার বিষয় দেখাবার জন্য তিনবার আমন্ত্রণ জানান।

সেখানে সবার সম্মুখে নিজের প্রস্তুত যন্ত্রপাতি দিয়ে তিনি তাঁর আবিষ্কারের প্রমাণ দেখান।

লণ্ডন ইউনিভারসিটি তাঁকে নানা সম্মানে ভূষিত করেন।

গাছপালা সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কারের প্রমাণ দেখে জার্মান বিজ্ঞানীরা আচার্য বসুকে তাদের দেশের পুরো ইউনিভারসিটি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু দেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্র তাঁদের বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ আমার জন্মভূমি। অতএব কর্মভূমিও আমার ভারতবর্ষ!'

অমর বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার

জেনারের জন্ম হয়, ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে। তার পুরো নাম এডওয়ার্ড জেনার। ইংলণ্ডের ছেলে।

জেনার যখন ডাক্তারি পড়তেন, তখন থেকেই তিনি ছিলেন বসন্ত রোগ সম্পর্কে কৌতূহলী।

বসন্ত রোগ থেকে আমাদের এই মানবসমাজকে কী ভাবে বাঁচানো যায় এ-বিষয়ে তখন থেকেই তিনি ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

জেনার যখন ডাক্তারির ছাত্র তিনি লক্ষ্য করলেন, যে সব গোয়ালিনী দুধ দোহন করে তাদের হাতে দেখা যায় দু'একটি বসন্তের গুটি।

তারা ঐ গুটিকে বলে গো বসন্ত। যাই হোক, এই গো-বসন্তের গুটি গোয়ালিনীর হাতেই থাকে সীমাবদ্ধ। শরীরের অন্য কোথায় আর ছড়ায় না। এমনকি বসন্তের মড়কের সময়ও না।

ব্যাপারটি দেখে জেনারের ভারি বিস্ময় জাগল।

অনেক গবেষণার পর তিনি বৈজ্ঞানিক প্রথাকে কাজে লাগালেন এজন্য তাঁর সময় লাগল পুরো ১৬ বছর।

১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে এই আবিষ্কারের কথা তিনি প্রচার করলেন। কিন্তু লোকে তাঁর কথা বিশ্বাস করল না। এমনকি জেনার তাঁর পরীক্ষার যে বিবরণী রয়েল সোসাইটিতে পাঠালেন, তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এলো।

জেনার কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। বরং তিনি নিজের সাধনায় দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগোতে থাকলেন।

সেবার ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দ।

সারা নেলচির নামে এক গোয়ালিনীর হাতের গো-বসন্তের

গুটি বীজ নিয়ে আট বছরের একটি ছেলেকে দিলেন। প্রতিষেধক টীকা।...

এই প্রথম টীকা যে নিল, তার নাম হল জেমস কিপ্‌স।

সেবার বসন্ত রোগ দেখা দিল মহামারী হয়ে।

কিন্তু না, এ ছেলেটির কিছুই হল না।

এই ঘটনার পর জেনার দৃঢ় নিশ্চিত হলেন যে 'বসন্ত' রোগকে তিনি পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

ধীরে ধীরে জেনারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ইউরোপে।

স্বয়ং সম্রাট নেপোলিয়ান এঁর কাছে টীকা নিলেন।

নেপোলিয়ান একবার বলেছিলেন, এই ব্যক্তিকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দরকার হলে এঁকে আমি সব দিতে পারি।

জেনার যে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন, সেই পথেই এসেছিলেন লুই পাস্তুর।

বড়ো বড়ো ব্যাধির জীবাণুদের হাত থেকে তিনি বাঁচিয়ে ছিলেন মানব সমাজকে।

'প্রতিষেধক' টিকা দেওয়াকে তিনি বিজ্ঞানের সুকঠিন যুক্তি-বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

বিজ্ঞানের যন্ত্র সভ্যতার আবিষ্কার

ইংরাজী ভাষায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে—'Necessity is the mother of invention', আবিষ্কারের জন্ম প্রয়োজনের তাগিদে। মানুষের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে এই একই কথার প্রতিধ্বনি। দশলক্ষ বছর আগে 'প্রাইস্টোসিন' যুগের গোড়া থেকেই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মানুষকে বাঁচার লড়াই-এ নামতে বাধ্য করেছে। আর এই লড়াই শুধুমাত্র আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মানুষকে ব্যস্ত করেছে। এবং তার জন্য প্রয়োজন নানাবিধ কৌশল। অজানাকে জানার ইচ্ছা জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানের আর বিজ্ঞান দিয়েছে মানুষকে গতি, সেই সঙ্গে স্বনির্ভরতার আশ্বাস। তাই যে প্রাগ-ঐতিহাসিক মানুষ একদিন বিদ্যুৎ চমক আর বজ্র-নির্দেশকে ভয়ে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত, তারাই উত্তর পুরুষকে বিজ্ঞান দেখাল বশীভূত করতে। ক্রমে অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত হল বিজ্ঞানের সাধনায়। মানুষ করায়ত্ত করতে শিখল প্রকৃতির দুর্জয় শক্তিকে। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে, আর এ যুক্তিকে হাতিয়ার করে মানুষ অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতিকে আনল নিজের নিয়ন্ত্রণে, নিজের ক্ষমতায় রাখল তাকে বশীভূত করে।

বিবর্তনের ধারাপথে মানুষের হাতের হাতিয়ার পরিবর্তিত হয়েছে যন্ত্রে, প্রশ্ন উঠতে পারে হাতিয়ার আর যন্ত্র কি আলাদা। বিজ্ঞান বলে, হ্যাঁ, তফাৎ অর্থাৎ আছে। একটা হল না জেনে অশিক্ষিত পটুত্বের প্রকাশ, অন্যটা হল নিয়ম খুঁজে তার বিস্মৃতি ঘটিয়ে, নতুন এক সম্ভাবনার দ্বারে পেঁছানো। যেমনটি সুর আর বাণীর সমন্বয়ে সঙ্গীত, তেমনি নিয়ম মেনে হাতিয়ারের যন্ত্রে

উত্তরণ ঘটে। মানব সভ্যতার আবর্তনের ধারায় একে একে এসেছে প্রস্তর, ব্রোঞ্জ আর লৌহ যুগ। এর সঙ্গে ক্রমবিকাশ ঘটেছে যন্ত্র নিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনার। তারই ফল হিসাবে ষোড়শ খ্রীস্টাব্দে এসেছে মুদ্রণ যন্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, কৃষি যন্ত্র, ঘড়ি, জাহাজ, বিদ্যুৎ, কম্পাস, পর্যটন, যোগাযোগ আর বাণিজ্য সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। যন্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় ইংলন্ডের শিল্প-বিপ্লব। এই শিল্প-বিপ্লবই সূচনা করে দিয়েছিল এক উজ্বল সম্ভাবনাময় নতুন যুগের। এলেন রবার্ট হুক, হাইগ্রেন্স, রবার্ট বরেল, নিউটনের মত অসামান্য প্রতিভাধর বিজ্ঞানীরা। তাঁরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখালেন যন্ত্র দিয়ে কায়িক শ্রম অনেকাংশেই লাঘব করা সম্ভব! যন্ত্রশক্তির নব নব উদ্ভাবন বয়ন-শিল্প, পরিবহন-ব্যবস্থা, প্রভৃতি নানা ব্যবস্থায় দেখা দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন, মানুষের জীবনে এলো নতুন কর্ম জোয়ার। যন্ত্রই মানুষের হাতে তুলে দিল উৎপাদন প্রাচুর্যের চাবিকাঠি। উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষ ক্রমে যন্ত্রকে ব্যবহার করতে শুরু করল বিলাস সামগ্রী উৎপাদনের জন্য।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল যন্ত্রের একাধিপত্য। যে মানুষ একদিন যন্ত্রের ওপর প্রভুত্ব করত, সেই মানুষ হয়ে পড়ল যন্ত্রের দাস। যে যন্ত্রের একদিন শুধুমাত্র ব্যবহার হতো মানুষের কায়িক শ্রমের লাঘবের হাতিয়ার হিসাবে, সেই যন্ত্রকে মানুষ ব্যবহার করতে লাগল অপর এক যন্ত্রের তদারকিতে। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থার উদ্ভব হলো, যেখানে যন্ত্রের তদারকিতে মানুষের ভূমিকা হয়ে উঠল নগণ্য—এলো অটোমেশন। অবশ্য বিজ্ঞানীরা যখন প্রথম এই ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিঃসন্দেহে মহৎ। তখন তাঁরা ভেবেছিলেন,

যন্ত্র মানুষকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি দেবে, যন্ত্রের জন্য কায়িক বা মানসিক কোন শ্রমের প্রয়োজন হবে না। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান যে মানুষের মস্তিষ্ক, তা চালিত হবে নব নব উন্মেষশালিনী আবিষ্কারের কাজে। অথচ মানুষ যা ভাবে, বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয় অন্যভাবে। কিছু অপরিণামদর্শী মানুষের হাতে পড়ে যন্ত্র হয়ে উঠল মানবজাতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এক একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালু হয়েছে, বিনিময়ে কিছু কিছু মানুষের জীবিকা অর্জনের পথ গিয়েছে বন্ধ হয়ে।

এখানেই শেষ নয়, যে যন্ত্র ছিল অনুসন্ধিৎসু মানুষের পক্ষে 'দিগদর্শক' তথ্য যোগাড় করার শক্তিশালী মাধ্যম, কিছু ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী মানুষ সেই যন্ত্রকে ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে তাকে ক্ষমতা বৃদ্ধির অস্ত্র হিসাবে গড়ে তুলল। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরমাণুকে ভেঙ্গে পাওয়া যায় প্রচণ্ড শক্তি। যে শক্তির কল্যাণমূলক ব্যবহার মানব সভ্যতার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ।

মহাকাশের সন্ধানে

অনাদিকাল থেকেই মানবচিত্ত বিস্ময়ে আকুল হয়েছে মহাবিশ্বের অন্তহীন জ্ঞান ভাণ্ডারের নানা খেলায়। অণু-পরমাণুর অদৃশ্য গতির আশ্চর্য ছন্দে, নটরাজের নৃত্যের তালে তালে কখনও বা সুদূর মহাকাশের অসীম ইশারার টানে। কিন্তু অমৃতের অভিযাত্রী মানুষ বিশ্বরহস্যের সত্যসন্ধানে চির উন্মুখ। তার কণ্ঠে নিয়ত ধ্বনিত হয় আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।

যুগ যুগান্তর ধরে মানুষ বিশাল রহস্যময়, সুদূর অজানা মহাকাশের ঘোমটা খুলবার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে চলেছে। অবশেষে এই প্রতিক্ষার অবসান ঘটল। মানুষ মহাকাশের পথে যাত্রা শুরু করল। শুরু হল আকাশ জয়ের এক নতুন ইতিহাস। মানুষ বুঝল, সূর্য তারকার প্রচণ্ড গ্যাস বহ্নিরূপে যে পরমাণুর লীলা, তারই রূপান্তর পৃথিবীর মাটিতে, সৌন্দর্য মানুষের প্রাণ ধর্মে, তার জ্ঞানাহুতিতে এবং সৌন্দর্য-বোধেও হচ্ছে স্ফুরিত।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো মাইল পর্যন্ত উঁচু অংশকে—আমরা আকাশ বলতে পারি। এই সীমারেখা পেরিয়ে গেলে পৃথিবীর ছাদ ফুটো করে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। যেখানে ঘাস নেই, ধুলো-বালি নেই, নেই সীমাহীন নীল আকাশ। অনন্ত প্রসারীর ঐ নিঃসীম শূন্যতাকেই বিজ্ঞানীরা মহাকাশ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে মহাকাশ যাত্রা চলেছে, অবশ্য আগে এই গবেষণা প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। মনীষী আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্ম গুপ্ত প্রভৃতি মনীষীর অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ গণিত বিদ্যার

চরম উৎকর্ষের ফলেই প্রাচীন ভারতবর্ষ এত সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে মহাকাশ গবেষণারও বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

মহাকাশ বিজ্ঞানকে সার্থক করে তুলতে যে বৈজ্ঞানিক মেধা ও দক্ষতার প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের তা যথেষ্ট রয়েছে। মানুষের কল্যাণকর কর্মে সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনায় মহাকাশ গবেষণা অজানা দিনে নিশ্চিত এক নবযুগের সূচনা করবে।

বিস্ময়কর আবিষ্কারে বিজ্ঞানীরা

তাঁর নাম অ্যানটনি। পুরোনাম অ্যানটনি ভ্যান লাভেনহুক। হল্যান্ডের একটি সিটি হলের দ্বাররক্ষক ছিলেন তিনি। তাঁর একটা অদ্ভুত নেশা ছিল। সেই নেশা হল ছোট জিনিসকে বড় করে দেখা। এ জন্য তিনি কাঁচ ঘষে ঘষে লেন্স বানাতেন।

তারপর সেই লেন্স ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার ওপর দিয়ে রেখে ফেলতেন ছোট জিনিসের ওপর। আর তখুনি ঐ অসম্ভব রূপ-কথার জগৎটি ধরা পড়ত।

রূপকে বলে রূপকথা। অ্যানটনি ভ্যান্ লাভেনহুক একবার তাঁর ঐ যন্ত্রের নীচে একটা সরু ভেড়ার লোম ধরে যে আকৃতি দেখেছিলেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর।

সেটা তখন আর লোম নয়। যেন একটি অমসৃণ গাছের গুঁড়ি।

আর মৌমাছির হুল এবং পা এই যন্ত্রে রেখে দেখে ইনি পাগলের মতন চিৎকার করে উঠেছিলেন। অসম্ভব! অবিশ্বাস্য— তবে বিস্ময়ের তখনো বাকি ছিল—বাগানের নালি দিয়ে তির তির করে বয়ে যাচ্ছিল জল।

একদিন সেই জল খানিকটা ধরলেন তাঁর ঐ যন্ত্রের নীচে।

আপাত দৃষ্টিতে জলটা মোটেই খারাপ ছিল না।

কিন্তু ঐ যন্ত্রের চোখে দেখা গেল অজস্র পোকা কিলবিল করছে জলের ওপর।

লাভেনহুকের চোখে সেই প্রথম নতুন জগৎ ধরা পড়ল।

আমাদের এত আছে অথচ এত অন্তরালে এইসব অদৃশ্য বীজাণুরা যে বাস করছে, তার খবর কে এতদিন রাখত?

অথচ এদের যে আমরা জয় করে ফেলেছিলাম। তা আর বলতে পারি কই ?

খ্রীস্টপূর্ব অস্টআশি অব্দে অক্টোডিয়াম সীজারের সৈন্যদলে সতের হাজার লোক আকস্মিক এক সংক্রামক ব্যাধিতে মারা যায়। কিন্তু কেন এই ব্যাধি তার কারণ জানা গেল না। একবার অ্যাবিসিনিয়ার ষাট হাজার সৈনিক হঠাৎ মারা গিয়েছিল, সে রোগেরও কোন সূত্র ধরা যায়নি। মোট কথা, এরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। নেপোলিয়নের প্রকৃত পরাজয় ঘটেছিল শত্রুর হাতে না 'টাইপস' ব্যাধির হাতে। এই সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইংলণ্ডের দেড় লক্ষ লোক মারা গেল। একা লণ্ডন শহরই কেড়ে নিল ষাট হাজার প্রাণ। বলা বাহুল্য এ সবই অদৃশ শত্রুর চক্রান্ত ছাড়া আর কী ?

সুতরাং সকলের চোখেই উদ্যত একটা জিজ্ঞাসা কে সেই অদৃশ্য শক্তি ? কোথায় থাকে তারা ?

এখন লাভেনহুকের ঐ সখের যন্ত্রটি সেই অদৃশ্য জগতের দরজা খুলে দিল। ঠিকানা নিয়ে এলো সেই আশ্চর্য জগতের। তবে এই লাভেনহুক পেশায় ছিলেন দারোয়ান, এই আশ্চর্য আবিষ্কারের ব্যাপারেও তিনি দারোয়ান হয়ে রইলেন কোন সময়েই ভেতরে ঢুকলেন না। তিনি কাঁচ ঘষে ঘষে লেন্স বানিয়ে যে যন্ত্রটি তৈরী করেছিলেন, তা এক মোটা ধরনের অনুবীক্ষণ যন্ত্র।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে 'অনুবীণ।' এই অনুবীণ চোখে লাগিয়ে জীবানুদের যে বিচিত্র জীবন লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, হুবহু তা লিখে পাঠিয়েছিলেন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির কাছে।

আর ঐ রয়াল সোসাইটি হুবহু ছেপে দিত ঐ অদৃশ্য জগতের ইতিহাস।

এই ভাবেই দেখতে দেখতে গড়িয়ে যায় বছরের পর বছর। চলে যায় যুগের পর যুগ।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজকুমার চলেছেন—অচিন পুরীর রাজকুমারীর সন্ধানে। পথে আছে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী।

তারা পথের সন্ধান দেয়।

এখানে প্রায় সেই রকমই হল।

অনুবীক্ষণের চোখে চোখ রেখে পাওয়া গেল সেই অচিনপুরের অনেক সংকেত। ঐ যে ছোট ছোট বীজাণুগুলি ধরা পড়ল, ওরা জানিয়ে দিল যে এরা হঠাৎ আসে না। এরা নিজেরাই সৃষ্টি করে নিজেদের। বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে প্রাণের উদ্ভব আপনা থেকেই হয়। এর জন্য প্রাণীর যে কোন ভূমিকা অনিবার্য ভাবে প্রয়োজন আছে, তা তারা বিশ্বস করতেন না। জীবাণুদের এই আশ্চর্য জগৎ আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে ঐ অনুমান ভুল।

এ নিয়ে কয়েকটি ঘটনা ঘটল। প্রথম ঘটনাটির নায়ক হলেন একজন ধর্মযাজক।

এই যাজকের নাম হল নীডহ্যাম। ইনি মধ্যযুগের চার্চের সংস্কারে আছন্ন ছিলেন। আর অ্যারিস্টটলের মত বিশ্বাস করতেন যে প্রাণের উদ্ভব আপনা থেকেই হয়।

এই বিস্ময়কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য একটি পরীক্ষা তিনি করে দেখিয়ে দিলেন পাঁচজনকে। উনুনের ওপর টগবগ করে ফুটছিল গরম মাংসের ঝোল। ঐ ঝোল তিনি বোতলে ভরলেন। তারপর তার মুখ ছিপি এঁটে বন্ধ করে রাখলেন। দিন কয়েক পরে ঐ বোতলে ভরা ঝোল পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তার ভেতর অসংখ্য জীবাণু কিলবিল করছে।

নীডহ্যাম দেখলেন, বন্ধ বোতলে জীবাণু এলো কোথা থেকে? এ নিশ্চয়ই আপনা থেকেই উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং তাঁর

ধারণা যে যতখানি ঠিক, তা পাঁচজনকে জাঁক করে বলে বেড়াতে লাগলেন।

ইটালী দেশের বিজ্ঞানী স্প্যালানজলি ব্যাপারটা সত্যি কি না যাচাই করবার জন্য নিজেই পরীক্ষা করে বসলেন।

নীডহ্যামের মতই সব করলেন। অত্যন্ত সতর্কভাবে।

এই সতর্কতার জন্য ফল কিন্তু একেবারে বিপরীত হল।

প্রথমে তিনি মাংসের ঝোলটিকে ভালো করে ফুটতে দিলেন। এমন উত্তপ্ত করলেন যে, সেই উত্তাপে যে কোন বীজাণু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তারপর বোতলে ভরবার সময় এমন ভাবে তা ভরে কর্ক দিয়ে এঁটে দিলেন যে, ঐ কর্কের ছিদ্র দিয়ে বা তার ছিদ্রপথে কোন বীজাণু যেন প্রবৃষ্ট হতে না পারে।

বলা বাহুল্য ফল এবার হাতে হাতেই পাওয়া গেল। দেখলেন, নীডহ্যামের পরীক্ষা ভুল। আর তাঁর প্রচারিত সত্যও একদম ভুলে ভরা। আপনা থেকে জীবনের উদ্ভব কখনো হয় না। বিজ্ঞানের সত্য হল, জীবন থেকেই প্রবাহিত হয় জীবনের ধারা।

এই ভাবেই আমাদের জীবন ধারা এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার চলছিল পাশাপাশি। আমরা আমাদের সংস্কারের ভেতরই ছিলাম আচ্ছন্ন, ছিলাম অভিভূত।

কিন্তু লুই পাস্তুর যেদিন বিজ্ঞানের জগতে এসে দেখা দিলেন সেদিন থেকে ঘটে গেল অন্য ঘটনা।

নদী এবার প্রবাহিত হল বিপরীত খাতে। এবং ঐ নদী রীতিমত বেগবতী।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে উত্তাপের ফলে জলে ও বাতাসের স্রোতে

বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে একটি তত্ত্ব জানিয়েছেন তা হল ঃ—

কেটলিতে জল ভরে আগুনে বসালে তা আস্তে আস্তে গরম হতে থাকে।

আগুনের তাপ লাগছে কেটলির তলায়, সেই তাপটা জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কি করে? আগুনে কেটলির তলাটা তেতে ওঠে, তার গায়ে লেপে জল থাকায়, তলার জল গরম হয়ে হালকা হয়। এই হালকা গরম জল তখন আর নীচে থাকতে পারে না, ওপরে উঠে আসে, ওপরের ঠাণ্ডা ভারী জল নীচে নেমে যায়!

এই জল আবার গরম হয়ে ওপরে উঠে যায়। অর্থাৎ আগুনে বসালে জলের মধ্যে একটা স্রোত জন্মে, গরম হয়ে নীচে থেকে জল ওপরে ওঠে, আর ঠাণ্ডা জল ওপর থেকে নীচে নামে।

এই ভাবে সমস্ত জল আস্তে আস্তে গরম হয়, সব জল একসঙ্গে একেবারে গরম হয়ে ওঠে না। কাঁচের গুঁড়ো বা ছোট ছোট কাগজের টুকরো গরম জলে ফেলে দিলে সে-গুলো ক্রমাগত ওপরে নীচে ওঠা-নামা করতে থাকে, জলের মধ্যে যে স্রোত চলেছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যে জলের ওপর-নীচে কোন ভেদই চোখে দেখি না, তার মধ্যে একই সময়ে গরম ও ঠাণ্ডা জলের একই স্রোত চলতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এই স্রোতটা কাঠের গুঁড়ো বা কাগজের টুকরোর যোগে স্পষ্ট করে দিয়েছে। আগুনে জল গরম হওয়ার ব্যাপারটাকে আমরা সহজ বলে ধরে নিই। কিন্তু এখন জানা গেল, এটা মোটেই সহজ নয়, জলের মধ্যে অনেকগুলো কাণ্ড থাকলে তবে জল গরম হয়।

গরম হাওয়ায় কী করে একটা স্রোত জন্মায় সে প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন ঃ—

আলো জেবলে তার কাছাকাছি ওপর দিকে হাত রাখলে যতটা গরম লাগে তার আশে পাশে তার কোথাও ততটা লাগে না।

শীতকালে আগনুন জেবলে তার চারদিকে বসে আমরাও আগনুন পোহাই।

পাশে বসে আগনুনের যতটা কাছে হাত দিতে পারি, তার ওপর থেকে ততটা কাছে নিতে গেলে হাত যাবে পন্ড়ে।

আগনুন জবালালে তার ওপরের দিকটা বেশী গরম হয়ে ওঠে কেন?

আগনুনে হাওয়া গরম হয়ে হালকা হয়, আর ওপরের দিকে উঠে যায়। আশে পাশের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হাওয়া ওই খালি জায়গা দখল করতে ছনুটে আসে, অর্থাৎ উত্তাপে হাওয়ার ভেতরে একটা স্রোত চলতে থাকে।

আগনুনের ওপর হাত রাখলে এই গরম হাওয়ার স্রোত এসে হাতে লাগে তাই এতটা গরম বোধ করি।

সনুর্যের তাপে মাটি গরম হয়, তার সংস্পর্শে এসে হাওয়া গরম হয়ে ওপরে উঠে যায়, ঠাণ্ডা হাওয়া চারদিক থেকে ছনুটে আসে ওই খালি জায়গা দখল করতে—কখনো কখনো হাওয়ায় এই চলা ফেরার বেগ এতটা বেড়ে ওঠে যে প্রবল আঘাতে বাড়ি-ঘর গাছ-পালা ভেঙে যায়।

ঝড়-তুফান, সাইক্লোন-টাইফুন আসলে কিন্তু এরা হাওয়ারই স্রোত। বেগের পরিমাপ অননুসারে এদের আমরা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি।

আকাশ বিহারে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৩৬ সাল।

রবার্টসন নামে এক ফরাসী সাহেব কলকাতার মাটিতে পা দিয়ে ঘোষণা করলেন ; আমি আকাশে উড়ব।

আকাশে উড়বেন ?

শহর কলকাতার দেশী মহল্লায় এই অভিনব সংবাদে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল।

কলকাতার তখন ভরা বসন্ত। চৈত্রমাসের মাঝামাঝি। আমের বোলে মৌমাছিদের ভিড়। শিমুল, পলাশ পরেছে আগুনের পোশাক। গাজনের সন্ন্যাসীয়া শিব সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে কলকাতার আশে- পাশে পথে পথে। সেই সময় শোনা গেল, মুচিখোলার মাঠে সাহেব বেলুনে আকাশে উড়বেন।

অকুস্থল মুচিখোলা। শহর কলকাতার অর্ধেক লোক ওখানে প্রায় ভেঙে পড়ল। সেদিন বুধবার। দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করেছে মুচি খোলার মাঠে। খোলা মাঠ। বাবুরা এলেন গাড়ী করে। এদিকে কলকাতার বাবুরা গঙ্গার বুকে বজরা ভাসিয়ে একে একে মুচিখোলার কাছাকাছি মাঠে এসে নামলেন। আর একদিকে পদব্রজে কত লোক যে এলো, তাদের কথা না জানাই ভাল।

তাদের হিসাব কে রাখে ?

সেদিন বেলুন উড়ল আকাশে। নির্মল—নীল আকাশ। মৃদু বাতাস ঠেলে বেলুনটি উড়ল। এক অভাবিত ব্যাপার লোকে হাঁ করে দেখল !

রবার্টসন সাহেবও বেলুনের সঙ্গে আকাশে উঠলেন। সাহেবকে উৎসাহ দিয়ে বাবুরা রুমাল নাড়লেন। এঁদের দিকে অভিনন্দন জানিয়ে সাহেবও নাড়লেন তাঁর হাত।

তারপর বেলুনের সাথী হয়ে এগোলেন ভাসতে ভাসতে।

উঠলেন ওপরে।

আরো ওপরে।

বেলুন চলল উত্তর থেকে দক্ষিণে।

বলা বাহুল্য শহর কলকাতায় এই হল 'বেলুন' এর প্রথম আবির্ভাব।

রবার্টসন সাহেব এই বেলুনের খেলা দেখিয়ে ভালোই রোজকার-পাতি করলেন।

টাকা পয়সার গন্ধ পেয়ে সাগরের ওপার থেকে আরো অনেক সাহেব দেখা দিলেন একে একে।

কলকাতার আকাশ তাই কোন সময়েই বঞ্চিত রইলনা, বেলুন সম্পদ থেকে।

এইভাবে কালের গতিতে ভাসতে ভাসতে বঙ্গদেশ পেঁছিল হিন্দুমেলার আমলে।

বেলুন রাজ স্পেনসার সাহেব সেদিন দাপটের সঙ্গে উড়িয়ে বেড়াচ্ছেন বেলুন। বেলুন ওড়ানোর ইতিহাসে পার্সিভাল স্পেনসারের নাম চিরকাল লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে।

গড়ের মাঠের হাজার হাজার লোকের সামনে তিনি উড়িয়ে দিতেন বেলুন। তারপর নেমে আসতেন প্যারাসুটে করে।

এদিকে হিন্দুমেলার কল্যাণে তখন জন্ম নিচ্ছে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ।

আর এ ব্যাপারে যিনি উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলেন, তিনি বিখ্যাত অ্যাডভানচ্যারিস্ট রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম বেলুন বিমানের নায়ক হলেন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিলনা। তাই তাঁর ঐ কাজের জন্য হাত বাড়াতে হল বিখ্যাত ধনী গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

গোপাল টাকা দিলেন। সেই টাকাতে থান থান তসর গরদ কেনা হল। তারপর তাই কেটে তৈরী হল—বেলুন। ঐ বেলুনে গ্যাস ভরে ওড়ান হল। রামচন্দ্র সেই বেলুনে উঠে উড়ে বেড়ালেন।

তবে এই ওড়ার ব্যাপারে একটু সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। একটা সুদীর্ঘ ও শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল ঐ ব্যোমযানটিকে, যাতে আকাশ বিহার করতে করতে বেলুনটি নিঃসীম শূন্যে হারিয়ে না যায়।

ওদিকে সাহেবরাও পাল্টা জবাব দিতে দেরী করলেন না।

গড়ের মাঠে তাঁরা উড়িয়ে দিলেন খোলা বেলুন।

ধীরে ধীরে গড়ের মাঠে নেমে এলো প্যারাসুট, আর সাহেবদের জয়োল্লাসে সারা কলকাতা ফেটে পড়লো!

তবে সেদিন জাতীয় হাওয়া অত্যন্ত প্রবল।

নিজের জীবনের থেকেও বড়ো তখন জাতীয় সম্মান।

তাই উদ্দীপিত হতে রামচন্দ্রের আর দেরী হল না।

রামচন্দ্র ঘোষণা করে দিলেন যে, খোলা বেলুনের খেলাই তিনি দেখবেন।

তারপর প্যারাসুট খুলে নামবেন যেমন সাহেবরা নামে।

রামচন্দ্রের এই ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের নত। লোকের

মুখে মুখে যথাসময়ে এ খবর গিয়ে পেঁছিল সাহেব পাড়াতেও।

না। এবারে গড়ের মাঠে নয়।

নারকেলডাঙায় যেখানে গ্যাস তৈরী হত, সেখানকার ময়দান হল বেলুন ওড়ানোর জায়গা।

হাজার হাজার লোক জমা হতে থাকল সেখানে। কলকাতায় প্রথম বেলুন ওড়ানোর দিন যেমন হয়েছিল, অনেকটা সেই রকম।

শুধু বাঙালী নয়,……

সাহেবরাও এলেন।

অনেকরই হাতে দূরবীণ।

এবারও গোপাল মুখোপাধ্যায়ের টাকাতে তৈরী হয়েছিল বেলুন।

যথাসময়ে সেই মহামূল্যবাণ বেলুন আকাশে উড়ল।

বেলুনের দড়িটি ছিল বাঁধা। সুদীর্ঘ শক্ত দড়িতে আটকানো!

কথা ছিল রামচন্দ্র ইশারা করলে রুমাল নাড়লে দড়ি কেটে দেওয়া হবে।

কিছুদূর বেলুনটি ভেসে চলার পর রামচন্দ্র রুমাল নাড়লেন। দড়ি কেটে দেওয়া হ'ল।

এরপর বেলুন ওপরে উঠতে আরম্ভ করল।

তারপর মেঘের উপর বেলুন ভেসে চলে।

আর স্তব্ধ বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাসে সকলে তাকিয়ে থাকে ওপরের দিকে।

কৌতুহলী চোখ দূরবীণ এঁটে অধীর আগ্রহে ওদিকে তাকিয়ে আছেন।

এমন সময় হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন রামচন্দ্র লাফিয়ে

পড়েছেন বেলুন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকানি মেরে ভারমুক্ত বেলুনটা আরো ওপরে উঠে গেল, আর রামচন্দ্র পাক খেতে খেতে নীচে নামতে লাগলেন। এই ভাবে বার কয়েক পাক খাবার পর প্যারাসুট গেল খুলে।

ত্রেতাযুগের রাবণ বিজয়ী রামের মতই গগনজয়ী রামচন্দ্র যেন পুষ্পক রথ থেকে নেমে আসতে লাগলেন।

না, এর পরে আর কোন কাহিনী নেই। গগনে এইভাবেই একটি যুগ শেষ হল।

পরে অবশ্য আমাদের দরজা অন্যভাবে খুলে গেল।

এতকাল ধরে যে মানুষ আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকে বেলুনই এখন বাস্তবে রূপায়িত করে।

তাই প্লেন, জেট, রকেট যতই আসুক না কেন, বেলুনের উত্তেজনাকে মানুষ বোধ হয় কোনদিন ভুলতে পারবে না।

গগন বিজয়ী রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে কোনদিনই কেউ ভুলতে পারবে না—তিনি আকাশে বেলুন ওড়ায় সাহেবদের প্রতিদ্বন্দী।

মহাজাগতিক বিস্ময় ঃ হ্যালির ধূমকেতু

রাতের আকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্কের দিকে তাকিয়ে মানুষের বিস্ময় বোধের অবধি থাকে না। কিন্তু বিস্ময়কর জ্যোতিষ্কের জগতেও আছে অপার মহা-জাগতিক বিস্ময়।

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রও মানুষের মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করে ঠিকই—কিন্তু মানুষের সঙ্গে এদের পরিচয় প্রতিদিনের।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ধূমকেতু বিশিষ্টতার দাবিদার—কেননা ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে কালেভদ্রে। আমাদের দিক থেকেও ঐ জ্যোতিষ্ক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

ধূমকেতু সম্পর্কে প্রায় মানুষের অসীম কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।

সম্প্রতি আকাশে হ্যালির ধূমকেতু প্রত্যক্ষ খবর পাওয়া গেছে। ৭৬ বছর অন্তর এই ধূমকেতুটি আকাশে আবির্ভূত হয়।

হ্যালির ধূমকেতুটি ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ১৯৪০ খৃীষ্টাব্দে।

তার আগে ১৮৩৫ খৃীষ্টাব্দে। ইতিহাসে তার প্রত্যেকটি আবির্ভাব কালের স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে।

অবশ্য হ্যালির ধূমকেতু ছাড়া স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে একাধিক ধূমকেতুকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

১৯৭০ সালে ধূমকেতু কেনেটকে আমরা দেখেছি। তার আগে ১৯৬৫-তে ইনেরা সেকিকে। ১৯৭৩-এ কোহুতেক ধূমকেতুটিকেও। ১৯৭৬ এসেছে ওয়েস্ট।

কুড়ি বছর আগে শেষ রাতের আকাশে প্রত্যক্ষ খবর এমন ধূমকেতুর স্মৃতি অনেকেরই মনে পড়বে।

ধূমকেতুর আবির্ভাব দুর্যোগের বার্তা বহন করে আনে বলে এককালে সবাই মনে করত।

সে যেন কোন অমঙ্গলের অগ্রদূত। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এক উজ্জ্বল ধূমকেতুর আবির্ভাব হয় আকাশে এবং সেই বছরে ইংলণ্ডের রাজার মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু ধূমকেতুর সঙ্গে অমঙ্গলের যোগাযোগ সেকালের সাধারণ মানুষের কুসংস্কারাছন্ন মনের পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

বর্তমানে ধূমকেতু আগমন বা ধূমকেতুর আবির্ভাব কোন ভাবেই অমঙ্গলের পূর্বাভাস বহন করে না।

ধূমকেতুর সম্পর্কে এক সময় মনে করা হত, এ হল বহির্বিশ্বের কোন বস্তু বা জ্যোতিষ্ক। সৌর জগতে হঠাৎ এদের প্রবেশ এবং প্রস্থান। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ধারনা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ধূমকেতুর গতিবিধি সর্বপ্রথম নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেন নিউটন। তিনি তাঁর মহাকর্ষ সূত্র প্রয়োগে প্রমাণ করেন যে ধূমকেতু সৌর পরিবারের বাইরে অবস্থিত। কোন জ্যোতিষ্ক নয়। বরং গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহনক্ষত্রের মত এরাও সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত, এবং সূর্যকে পরিভ্রমণ করে চলেছে।

এ পর্যন্ত যত ধূমকেতুর পরিচয় জানা গেছে। তাদের অধিকাংশই অনুজ্জ্বল। বিশেষ শক্তি সম্পন্ন দূরবীণ ছাড়া এদের লক্ষ্য করা কঠিন। উজ্জ্বল ধূমকেতুর সংখ্যাও বেশী নয়। আকাশে অতি উজ্জ্বল ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে কদাচিৎ।

আকাশে এক একটি ধূমকেতু প্রত্যক্ষ করার ফল এক এক রকমের।

এমন কতকগুলি ধূমকেতু আছে সেগুলি মাত্র দেখা যায় কয়েক দিনের জন্য। কোনটি বা দেখা যায় একাধিক সপ্তাহ ধরে। মাসের পর মাস দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে, এমন ধূমকেতু প্রায় দুর্লভ।

ধূমকেতুর আকার বলতে বোঝানো হয় কেন্দ্রীয় অংশ নিয়ে ঝাঁটার মত চেহারাটি।

কিন্তু সব ধূমকেতুর ঝাঁটার মত লেজ হয় না।

আর যে সব ধূমকেতুর লেজের উৎপত্তি হয়, তা হয় সূর্যের কাছাকাছি এগিয়ে এলে।

ধূমকেতু সূর্যের যত কাছাকাছি যত এগিয়ে আসে, ততই তার লেজ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

আর সূর্যকে ঘুরে দূরে চলে যাওয়ার সময়ে, ততই তার লেজ সংকুচিত হতে থাকে।

আকাশে এক সময়ে তা অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই ধূমকেতুর লেজের অবস্থানের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সূর্য যেদিকে থাকে, ধূমকেতুর লেজের অবস্থানের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সূর্য যে দিকে, ধূমকেতুর লেজ সব সময় প্রলম্বিত হয় তার বিপরীত দিকে।

ধূমকেতুকে সাধারণত তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়—কেন্দ্রীয় অংশ, লেজ এবং কেন্দ্রীয় অংশকে নিয়ে আলোর ছটা। সুখ্যাত মিথেন, অ্যামোনিয়া, এবং জল ঘণীভূত হয়ে ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশটি গঠিত হয়েছে।

ধূমকেতুর একটি লেজ আছে বলে সাধারণত মনে হলেও আসলে ধূমকেতুর লেজের সংখ্যা দুই। এক একটি ধূলি দুস্থ অন্যটি এজরাদুস্থ। ধূমকেতুর নিজস্ব কোন আলো নেই। সেইজন্য ধূমকেতু সূর্যের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত তাকে দেখা যায় না। তা ছাড়া এতে বস্তুর পরিমাণ এত ঘণ যে, প্রতিফলিত আলো যৎসামান্য। সেই জন্যে কোন ধূমকেতু খালি চোখে নজরে আসে না।

সূর্যকে পরিভ্রমণরত এক একটি ধূমকেতুর আবর্তনকাল এক এক রকমের। বর্তমানে তালিকাভুক্ত ধূমকেতুর সংখ্যা প্রায় ৬৬০-টি। এর মধ্যে প্রায় ৫৫০-টির ধূমকেতুর আবর্তনকাল অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ২০০ বছরের বেশী। এদের ভেতর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে কোন কোন ধূমকেতুর সময় লাগে কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ বছর। এই সব ধূমকেতুকে বলা হয় দীর্ঘ পর্যাবৃত্ত ধূমকেতু। এক ধরণের সব ধূমকেতু, যারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফিরে আসে তাদের বলা হয় নির্মিত। উপবৃত্তাকার পথে যুক্ত নেই ধূমকেতুর নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘুরে আসা সম্ভব।

সাধারণত প্রথম পর্যবেক্ষকের নাম অনুসারে ধূমকেতুর নামাকরণ হয়ে থাকে।

কিন্তু হ্যালির ধূমকেতুটি সেদিক থেকে ব্যতিক্রম।

এই বিশিষ্ট ধূমকেতুটির সঙ্গে হ্যালির নাম যুক্ত হওয়ার কারণ —হ্যালি এই ধূমকেতুটির পরিভ্রমণ পথ, পরিভ্রমণকাল নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে নিউটনের গবেষণা তাঁকে সর্বাধিক সাহায্য করে।

হ্যালি গণনা করে দেখেছিলেন, সূর্যকে একবার পরিভ্রমণ করতে এই ধূমকেতুটির সময় লাগা উচিত ৭৬ বৎসর।

হ্যালির ধূমকেতু আবির্ভূত হয় ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে। হ্যালি ভবিষ্যৎবাণী করেন, এই ধূমকেতুটির পরবর্তী আবির্ভাবকাল ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর মৃত্যুর ১৬ বৎসর তাকে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বড় দিনের সময় এই ধূমকেতুটি আবির্ভূত হয়।

বর্তমান শতাব্দীতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের ২০ তারিখে হ্যালির ধূমকেতুর গতিপথ ছিল সূর্যের সব চেয়ে কাছাকাছি। বর্তমান আবির্ভাবে এ ধূমকেতুটি সূর্যের নিকটবর্তী হয়েছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ তারিখে।

হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাবে বিজ্ঞানীদের ধূমকেতু সমন্ধে আরও গরেষণা করার সুযোগ হয়েছে।

পিল্‌ট ডাউনের খুলি

বিলাতের 'পিলট ডাউন' বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে কতগুলো মজুর মাটি খুঁড়ছিল।

মাটির মধ্যে মাঝে মাঝে পাথরের টুকরোর মত কি সব জিনিস বের হত।

একজন সাহেব সেগুলো দেখে পয়সা দিয়ে কিনে নিত।

সেগুলো প্রাচীন মানুষের চিহ্ন—মজুররা কিন্তু তা জানত না।

মজুররা পয়সার লোভে সেগুলো সংগ্রহ করে রাখত।

কিন্তু সাহেবটি পিছন ফিরলেই হাসাহাসি করত।

আর বলত—'লোকটার মাথায় কিছু গোলমাল আছে।'

একদিন হঠাৎ হাড়ের মত এক টুকুরো জিনিস পেয়ে সেই সাহেবের উৎসাহ ভয়ানক বেড়ে গেল।

এর কিছুদিন বাদে আর এক বিজ্ঞানী এসে সেই সাহেবের সঙ্গে মাটি কাটতে আরম্ভ করলেন।

একটা যায়গায় দুইটি লোককে পেয়ে মজুরদেরও আমোদ বেড়ে গেল। কেননা বিজ্ঞানীদের কেন এত উৎসাহ তা তারা বুঝতে পারেনি।

দুইজনের যে চেষ্টায় যা অবিষ্কার হল বৈজ্ঞানিকরা তার নাম দিয়েছেন 'পিলট ডাউনের খুলি'।

এটা একটা অতি প্রাচীন কালের একটা মানুষের খুলির টুকরো।

বিজ্ঞানীরা বলেন, অতি প্রাচীনকালের মানুষের এমন চিহ্ন আর পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হল, খুলিটার বয়স কত?

তারই জন্য—বয়স অনুসন্ধানের ব্যাপারে দু'জন বিজ্ঞানী ছয়মাস ধরে—মাটিতে বসে রইল জাল বিছিয়ে।

আর্কিমিডিসের তত্ত্ব

আজ থেকে প্রায় বাইশ শত বছর আগে গ্রীস সাম্রাজ্যের অধীনে' সাইরাকিউস নগরে আর্কিমিডেসের জন্ম হয়।

আর্কিমিডিসের মতো অসাধারণ পণ্ডিত সেকালে গ্রীক জাতির মধ্যে আর দ্বিতীয়তো ছিলনা—সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল কিনা সন্দেহ।

দিন রাত তিনি নিজের বই পত্র নিয়ে কী যে চিন্তায় ডুবে থাকতেন। আর অংক কষে কষে কত যে আশ্চর্য তত্ত্বের হিসাব করতেন, লোকে তার কিছুই বুঝতনা।

কেবল দশজন পণ্ডিত-লোকে পরম আগ্রহে আদর করে তাঁর সংবাদ নিতেন আর অবাক হয়ে বলতেন 'পণ্ডিতের মতো পণ্ডিত যদি কেউ থাকে, তবে সে হচ্ছে আর্কিমিডিস'।

সাইরাকিউসের রাজা হীয়েরো ছিলেন আর্কিমিডিসের বন্ধু। তিনি কেবলই বলতেন, 'এত বড় পন্ডিত হয়ে তোমার কি লাভ হল?

যদি লোকে তোমার কদর না বোঝে? তুমি কেবল বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্ব আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হিসাব নিয়ে থাক, কিন্তু মানুষের কাজে লাগে, এমন সব তত্ত্ব করে দেখাও, লোকে বুঝুক যে তুমি বড় পণ্ডিত?

বন্ধুর কথায় আর্কিমিডিস মাঝে মাঝে কাজের জিনিস গড়বার দিকে মন দিতেন।

বড় বড় মালপত্র বোঝাই হয়ে এত যে কলের গাড়ি আর এত যে জাহাজ পৃথিবী ছুটে বেড়াচ্ছে, আর বড় বড় কারখানার

এত ভারী ভারী কল নানান লোহা-লক্কর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, সাবধানে মাল উঠা-নামার জন্য 'কুলি' না হলে চলে না। এইসব কলকব্জা তৈরী করে আর্কিমিডিস নতুন যুগের সূচনা করেন।

আর্কিমিডিসের নানা রকমের কলকবজা তৈরী করেছিলেন আজ তাই আমরা দেখতে পাই।

আর্কিমিডিসের জীবনের একটা গল্প বোধ হয় অনেকেরেই জানা আছে।

রাজা হীয়েরো এক সেক্রার কাছে একটি সোনার মুকুট গড়তে দিয়েছিলেন।

সেক্রা মুকুট গড়ে ছিল ভালোই। কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হল যে, সে সোনা চুরি করেছে এবং সেই চুরি ঢাকবার জন্য মুকুটের মধ্যে খাদ মিশিয়াছে।

কোন সহজ উপায়ে এই চুরি ধরা যায় কিনা জানবার জন্য তিনি আর্কিমিডিসকে ডেকে পাঠালেন।

আর্কিমিডিস সব শুনে বললেন, একটু ভেবে বলব।

ভাবতে ভাবতে কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন স্নানের সময় কাপড় ছেড়ে সবে তিনি স্নানের টবে পা দিয়েছেন, এমন সময় খানিকটা জল উছলিয়ে পড়ল।

আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ সেই প্রশ্নের এক চমৎকার মীমাংসা তাঁর মাথায় এল।

তখন কোথায় গেল স্নান। তিনি তখুনি 'পেয়েছি পেয়েছি' বলে রাস্তায় ছুটে বের হয়ে এলেন।

যে জিনিস পেয়ে তিনি আনন্দে এমন আত্মহারা হয়েছিলেন, বিজ্ঞানে এখনো তাকে 'আর্কিমিডিসের তত্ব' বলা হয়।

ভারী জিনিসগুলো জলে রাখলে তার ওজন কমে যায়।

কি পরিমাণ কমবে, তারও হিসাব করে বলা হয়।

কোন হালকা জিনিসকে জলে ভাসালে তার খানিকটা ডোবে, খানিকটা ভেসে থাকে। ঠিক কতখানি ডোবে তারও হিসাব আছে আর্কিমিডিসের তত্ত্বে সেই সকল কথারই আলোচনা করা হয়েছে।

আর্কিমিডিস রাজাকে বললেন, ঐ মুকুটের ওজন যতখানি, ঠিক সেই ওজনের সোনা নিয়ে একটা জল ভরা পাত্রে পরীক্ষা করতে হবে। পাত্রের মধ্যে মুকুট ডুবিয়ে দিলে, কতখানি জল উপচিয়ে পড়ে, তা মেপে দেখুন। মুকুট যদি খাঁটি সোনার হয়, তবে দুইধারে ঠিক একই পরিমাণে জল বের হবে। যদি খাদ মেশানো থাকে, তবে মুকুটটা সেই ওজনের সোনার চাইতে আয়তনে কিছু বড় হবে, তবে দুবারে ঠিক একই পরিমাণে অপসারিত হবে। যদি খাদ মেশানো থাকে, তবে মুকুটটা সেই ওজনের সোনার চাইতে আয়তনে কিছু বড় হবে। সুতরাং তাতে বেশি জল ফেলে দেবে।

কোনো কোনো চশমার কাঁচ এমন থাকে যে তাতে অনেকখানি সূর্যের আলোককে অল্প জায়গার মধ্যে ধরে আনা যায়।

সেই রকম কাঁচ বেশ বড় করে বানালে, তার মধ্যে রোদ ধরে আগুন জ্বালানো চলে। গর্তওয়ালা আরশি দিয়েও এই কাজটি করানো যায়।

আর্কিমিডিস এই রকম আরশিও বানিয়েছিলেন।

শোনা যায়, রোমের যুদ্ধ জাহাজ যখন 'সাইরাকিউস' আক্রমণ করতে আসে, তখন তিনি এই রকম আরশি দিয়ে কড়া রোদ ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।

কেবল তাই নয়, রোমীয় সেনাপতি মার্সেলাস যখন সৈন্য সামন্ত নিয়ে 'সাইরাকিউম' আক্রমণ করতে আসেন তখন

আর্কিমিডিস নগর রক্ষার জন্য নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন নূতন যুদ্ধ-যন্ত্রের আয়োজন করেন। সে সকল যন্ত্রের পরিচয় পেয়ে রোমীয় সৈন্যরা বহুদিন পর্যন্ত নগরে আসতে সাহস পায়নি।

তারপরে যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে আর্কিমিডিসের অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা লোকের মুখে মুখে শোনা যেত।

রোমীয় সৈন্যরা সে সকল যুদ্ধ-যন্ত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়লে বেশ বোঝা যায়, সেগুলো তাদের মনে কি রকম ভয়ের সঞ্চার করছিল।

রোমীয় সৈন্যরা বড় বড় থামের মত পাথর ছুঁড়ে মারে আর পর মুহূর্তেই দেওয়ালের পিছনে ডুব মারে।

বড় বড় কলের ধাক্কায় কড়ি বরগা ছুটে শত্রুর জায়গায় পড়ে। দূর থেকে প্রকাণ্ড কামানের সাড়াশি চালিয়ে শত্রুর জাহাজ নগর ছেড়ে দূরে হটে গেল।

মার্সেলাস বললেন, যুদ্ধ করে সাইরাকিউস দমন করা কারও সাধ্য নয়। তোমরা পথ ঘাট আটকিয়ে এইখানে বসে থাক। নগরের খাদ্য যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন আপনা থেকে এরা চলে যাবে। এদের হার হবে।

প্রায় তিন বৎসর বিনাযুদ্ধে রোমীয়রা 'সারাকিউসের' চারিদিকে ঘিরে ফেলল। তারপর নগরের লোকদের যখন না খেয়ে মারা যাবার অবস্থা হল, তখন 'সাইরাকিউস' দখল করা সহজ হল।

মার্সেলাস হুকুম দিলেন, যাও নগর লুট করে এসো। কিন্তু সাবধান পণ্ডিত আর্কিমিডিসের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

আর্কিমিডিস তখন কি একটা হিসাব করছিলেন, নগরে কোথায় কি ঘটছে তা তার খেয়াল নেই। কতকগুলো অংক ও রেখা কষে তারই চিন্তায় তিনি তন্ময় হয়ে আছেন।

রোমীয় সৈন্যরা সেই ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধকে আর্কিমিডিস বলে চিনতে পারল না। তারা চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকে তার পরিচয় জানতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁর চিন্তার মধ্যে এমন তন্ময় হয়ে ছিলেন যে সে কথা তাঁর কানে গেল না।

তিনি এবারে খালি হাত তুলে বললেন, 'হিসাবে ব্যাঘাত করো না।'

মূর্খ সৈনিক তৎক্ষণাৎ তলোয়ারের আঘাতে তাঁর মাথা কেটে ফেলল।

তাঁর জীবনের শেষ হিসাব আর সম্পূর্ণ হল না। তাঁর রক্ত ধারায় সে হিসাব মুছে গেল।

কি তত্ত্বের আলোচনায় তিনি এমন করে তন্ময় ছিলেন তা জানবার আর কোন উপায় ছিল না।

আর্কিমিডিসের মৃত্যু সংবাদ শুনে মার্সেলাসের দুঃখের আর সীমা রইল না।

তিনি পরম যত্নে আর্কিমিডিসের কবরের উপর একটি সুন্দর সমাধি নির্মাণ করেন।

তারপর দুই হাজার বছর পার হয়েছে মানুষের ইতিহাসে এই বিজ্ঞান বীর এখনও অমর হয়ে আছে।

প্রাণিতত্ত্বের আবিষ্কারে ডারুইন

ছেলেবেলায় শোনা যেত, 'মানুষের পূর্বপুরুষ বানর ছিল। ডারুইন নামে কোন এক পণ্ডিত নাকি এ কথা বলেছেন।

কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, বাস্তবিক ডারুইন এমন কথা কোনদিন বলেন নি।

আসল কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে বানর ও মানুষের পূর্ব-পুরুষ একই ছিল।

পড়ার দিকে চার্লস ডারুইনের বুদ্ধি খুলত না।

কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ছিল।

সেটি কেবল নানা অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহ করা।

শামুকঝিনুক হতে আরম্ভ করে…পুরাতন ভাঙা জিনিস বা পাথরের কুচি পর্যন্ত নানা জিনিসেও তাঁর বাক্স ও পড়বার টেবিল বোঝাই হয়ে থাকত।

বালকের এই আগ্রহ—অন্য লোকের কাছে অন্যায় বাতিক বা উপদ্রব বলেই মনে হত।

কিন্তু তবুও তাকে কেউ বাধা দিত না। কারণ, ডারুইনের মনটা স্বভাবতই এমন কোমল এবং তার স্বভাব এমন ছিল যে, সকলেই তাঁকে ভালবাসত।

ছেলেবেলায় পড়ার মধ্যে একটি বই ডারুইন খুব মন দিয়ে পড়েছিলেন, তাতে পৃথিবীর নানা অদ্ভুত জিনিসের কথা ছিল।

সেই বই পড়ে তাঁর মনে দেশবিদেশে ঘুরবার সখ জেগে ওঠে।

কলেজে এসে ডারুইন প্রথমে গেলেন ডাক্তারি শিখতে। সে সময়ে ক্লোরোফর্ম ছিল না। তাই রোগীদের সংজ্ঞাহীন না করেই অস্ত্র-চিকিৎসার ফলে ভীষণ কষ্ট ভোগ করতে হত।

সেই যন্ত্রনার দৃশ্য দেখে করুণহৃদয় ডারুইনের মন এমন দমে গেল যে, তাঁর আর ডাক্তারি শেখা হল না।

তখন তিনি ধর্মযাজক হবার ইচ্ছায়—স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে ইংলণ্ডে ধর্মতত্ত্ব শিখতে এলেন।

এখানে এসে তিনি অসুবিধার মধ্যে পড়লেন। কারণ ছেলে-বেলায় তিনি গ্রীক প্রভৃতি যা শিখেছিলেন, এই কয় বছরে তিনি প্রায় সব ভুলে গিয়েছিলেন।

ভোলেন নি সেই নানান জিনিস সংগ্রহের অভ্যাসটা।

কলেজে তাঁর সতীর্থরা দেখতেন, সুযোগ পেলেই মাঠে ঘাটে জঙ্গলে তিনি পোকা মাকড় সংগ্রহ করে ফিরছেন।

আবার হয়তো কোনদিন সারা দিন কোন পোকার বাসার কাছে বসে তার চালচলন স্বভাব সমস্তই মন দিয়ে দেখছেন।

এ বিষয় কেবল নিজের চোখে দেখে তিনি এমন সব আশ্চর্য জিনিস তিনি সংগ্রহ করে রাখতেন যা কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় না।

বন্ধুরা এই সব নিয়ে তাঁকে অনেক কথা বলতেন। কিন্তু তিনি তাঁর নীরব সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন।

এমনি করে বাইশ বছর কেটে গেল ১৮৩১ খৃীষ্টাব্দে 'বীগল' নামে এক জাহাজে পৃথিবী ভ্রমণে বের হলেন।

ডারুইন বিনা বেতনে প্রাণিতত্ত্বের সংগ্রহের জন্য তাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি পেলেন।

পাঁচ বৎসর জাহাজে করে তিনি পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরে

বেড়াতে থাকলেন, এবং প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে তিনি পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরে বেড়ালেন।

শুধু তাই নয় প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে এমন সব আশ্চর্য নূতন জ্ঞান লাভ করলেন যে, তা তাঁর সমস্ত চিন্তা ও জীবনকে একেবারে নূতন পথে নিয়ে গেল।

ডারুইনের মতে, এই তাঁর জীবনের সব চাইতে বড় ঘটনা।

তারপর কুড়ি বৎসর ধরে ডারুইন এই সব বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করতে লাগলেন।

প্রাচীনকালে যেসকল জীবজন্তু পৃথিবীতে ছিল, আজ তারা নেই, কেবল কতকগুলো কঙ্কাল চিহ্ন দেখে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

আজ যেসব জীবজন্তু দেখা যায়, তারা কেউ হঠাৎ দেখা দেয় নি, এরা সকলেই সেই আদিম কালের কোন না কোন জন্তুর বংশধর।

কেমন করে এই পরিবর্তন হল ?

এ রকম পরিবর্তন হবার কি কারণ ? যে গাছের ফল তার বীচি পুঁতলে সেই ফলেরই গাছ হয়। তাতে বেশতো ফল ধরে। আমরা কি তাই দেখি।

যে জন্তুর আকার-প্রকার যেমন, তার ছানাগুলোও হয় সেই রকম। শেয়ালের বংশে শেয়ালই জন্মে।

ডারুইন দেখলেন, তিনি যেসব নূতন তথ্য জেনেছেন, তার মধ্য থেকেই নানা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এই সকল প্রশ্নের ও সন্দেহের মীমাংসা করা যায়।

যাহারা ওস্তাদ মালী তারা ভালো ভালো গাছের কলম করবার সময় বা বীজ পুঁতবার সময় যে সে গাছের বীজ কলম নিয়ে বীজ করে না। ভালো ফুল, ভালো গাছ, ভাল ফল বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে নানা ভাবে মিশিয়ে দিয়ে খুব সাবধানে পছন্দ মতো গাছ ফুটিয়ে তোলে। যেগুলো তার পছন্দ নয়, সেগুলোকে সে একেবারে বাদ দেয়।

তার ফলে অনেক সময় গাছের চেহারায় আশ্চর্য রকমের উন্নতি ও পরিবর্তন দেখা যায়।

একটা সামান্য জংলী ফুল আজ মানুষের চেষ্টা ও যত্নে সুন্দর গোলাপ হয়ে ফুটছে।

ডারুইন দেখলেন, মানুষ বুদ্ধিতে যে রকম নিজেই চলে, প্রাণিজগতেও সর্বত্রই স্বাভাবিক ভাবে সেই রূপে কাছাকাছি চলে। যারা রুগ্ন ও দুর্বল মরবার সময় তারাই আগে মরে। যারা সবল তারা বাইরের নানা অবস্থার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

কারও গায়ে জোর বেশী, সে মরে বাঁচে।

কেউ খুব ছুটতে পারে, সে শত্রুর কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচে। কারো চামড়া মোটা, সে শীতের কষ্ট সয়ে বাঁচে। কারো হজম-শক্তি খুব মজবুত, সে নানা জিনিষ খেয়ে বাঁচে।

কারো গায়ের রঙ এমন যে হঠাৎ চোখে মালুম হয় না।

সে লুকিয়ে বাঁচে।

বাঁচবার মতো যার গুণ নেই, সে বেচারা মারা যায়। আর সেই সব গুণ আর লক্ষণ যাদের আছে তারাই বেঁচে থাকে।

তাদেরই বংশ বিস্তার হয়।

এইভাবে সংগ্রাম করতে করতে বাইরের নানা অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক জন্তুর চেহারা নানা রকম ভাবে গড়ে ওঠে।

ডারুইন দেখালেন, এইরূপে আরো নানা কারণে, আপন থেকেই এক একটা জন্তুর চেহারা নানা রকমে বদলে যায়।

ডারুইনের কথা বলতে গেলে দুটো গুণের কথা বিশেষ করে বলতে হয়।

একটি তাঁর অক্লান্ত অধ্যবসায়। আর একটি তাঁর মিষ্টি স্বভাব। তাঁর শরীর কোন কালে সুস্থ ছিল না—জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সে শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

কিন্তু তাঁর মনের শক্তি আশ্চর্য রকমের সতেজ ছিল।

প্রতিদিন ভোরের আগে ঘুম থেকে উঠে তিনি বাগানে যেতেন। সেখানে ফুল-ফল-মৌমাছি আর প্রজাপতির সঙ্গে পরিচয় করতে করতে কোন দিক দিয়ে যে তাঁর সময় কেটে যেত—তা তার খেয়াল ছিল না।

ডারুইনকে যাঁরা জানতেন, তাঁরা বলেন যে, সকলকে প্রাণ দিয়ে এমন ভালবাসত আর কেউ তা করে না। শুধু মানুষ নয়, পশুপক্ষী নয়, গাছের ফুলটিকে পর্যন্ত তিনি এমন ভাবে স্নেহের চোখে দেখতেন যে লোকে অবাক হয়ে যেত।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে ইংরাজরা সেই বিজ্ঞান বীরকে নিউটনের পাশে সমাধি দেন।

চাঁদের জগতে আবিষ্কার

মানুষের চোখে অন্তরীক্ষলোক অপার বিস্ময়!

সুন্দর নীল আকাশে মেঘের বিচিত্র খেলা, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র—এসব মানুষকে আকর্ষণ করে।

মানুষ ভাবে, আমি যদি পাখি হতাম, থাকত যদি ডানা, তা হলে আবার শূন্যলোকে বিচরণ করা যেত।

অতীতের মানুষ আকাশকে কাছে পায় নি। তাই কলপনাতে সে আকাশচারী হয়েছে। রূপকথার রাজপুত্র পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আকাশ পাড়ি দিয়েছে। পুরাণে নারদমুনি ঢেঁকিবাহনে স্বর্গে··· মর্ত্যে··· ভ্রমণ করেছেন।

কেউবা পুষ্পক রথে স্বর্গে গিয়েছেন।

কিন্তু এত করেও আকাশকে বাস্তবের হাতের মুঠোয় আনা যায় নি।

হাজার হাজার মা তাদের সোনার যাদুর কপালে টিপ দেবার জন্য চাঁদকে ডেকেছেন।

মানুষ তাতে হতাশ হয় নি।

মানুষের আশা অনন্ত···জানার আগ্রহও অসীম। তাঁদের বিপুল, উদ্যম, অদম্য উৎসাহ। সেই সৃষ্টির ফলে বিজ্ঞানের সাধনায় পঙ্খিরাজ ঘোড়া বেলুন বিমান রকেট বাস্তবরূপে পরিগ্রহ করছে।

কিন্তু বিমানে আকাশে ওঠার সীমা কতটুকু? যতদূর বায়ুমণ্ডল আছে, যতদূর পৃথিবীর আকর্ষণ আছে, ততদূর পর্যন্ত বিমান উঠতে পারে।

কিন্তু মানুষ যে তারও ওপর উঠতে চায়।

পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে সে যেতে চায় চন্দ্রলোকে, সপ্তর্ষি লোকে কিংবা ধ্রুব লোকে।

মানুষের এই ইচ্ছাই মানুষকে চন্দ্র বিজয়ে উৎসাহিত করেছে। অতন্দ্র সাধনার বলে সে চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছে।

সে হিসাব ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তারিখটি মানবের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় দিন।

এই দিনটিতেই দুটি মানব সন্তান চাঁদের বুকে তাঁদের চরণ চিহ্ন এঁকে রেখে এসেছেন।

মহাকাশ জয় করার পক্ষে এ উল্লেখযোগ্য সংবাদ।

অবশ্য প্রতিটি সাফল্যের পশ্চাতে প্রয়োজন প্রস্তুতি। বিজ্ঞানের যুগে প্রস্তুতি যে কত দ্রুত অগ্রসর হতে পারে, তার প্রমাণ চন্দ্র বিজয়ে ইতিহাস।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষ পালিত হয়েছিল, তাতেই বৈজ্ঞানিকগণ সমবেত হয়ে ভূলোক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে এগিয়ে গেলেন দুটি দেশ—রাশিয়া ও আমেরিকা।

রাশিয়া রকেট যোগে সর্বপ্রথম মহাকাশে স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করে সকলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেন।

পৃথিবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করে বিদ্যুৎ বেগে সে উপগ্রহ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে।

আমেরিকাও পশ্চাতে থাকে নি। তবে প্রথম দিকে প্রতিযোগিতায় ছিল রাশিয়ারই জয়।

মহাকাশের বুকে প্রথম প্রাণিদেহের প্রেরণে রাশিয়ার কীর্তি।

সে অভিযানের নায়ক হলো একটি কুকুর।

কুকুর লাইকা জীবন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরতে পারে নি। কিন্তু আকাশ জয়ের অনেক তথ্য সে সরবরাহ করে গেছে।

মহাকাশে উঠে উপগ্রহের মত জীবন্ত মানুষের ভূ-প্রদক্ষিণও রাশিয়ার কীর্তি। এই অভিযানের নায়ক ইউরি গাগারিণ।

কিন্তু মহাকাশ জয়ে রাশিয়ার ভূমিকা প্রধান হলেও আসল চন্দ্র বিজয়ের গৌরব আমেরিকার।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদচিহ্ন অংকনে নায়ক তিনজন—নিল-আর্মস্টং, এডুইন আনড্রিল ও মাইকেল কলিন্স।

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই 'কেপ ফেলো' নামের মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এবং অ্যাপোলো ১১ নামে বিশেষ মহাকাশ যানে চন্দ্র অভিযানে যাত্রা করেন।

অ্যাপোলো ১১ মহাকাশ যানের নির্মাণ কৌশল অপূর্ব। এ' পৃথিবী থেকে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত চাঁদে পেঁছাতে হবে। পথের নানা বিপদকে কাটিয়ে উঠতে হবে চাঁদের রাজ্যের কাছাকাছি গিয়ে অন্য একটা যানে চাঁদে নামতে হবে।

আবার চাঁদের রাজ্য থেকে আরোহণ করে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে হবে।

কাজেই এই যন্ত্র নির্মাণে নানাভাবে বিজ্ঞানীদের মাথা খাটাতে হয়েছে।

এক কথায় চন্দ্র বিজয়কে সফল করতে একসঙ্গে সহায়তা করেছে ভূ-বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জীব বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানও অর্থ বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা।

মানুষের চিন্তা ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে একদিন এই মহাকাশ যানে তিনজন সওয়ারি আকাশে উঠে গেলেন।

নীচে মাটির পৃথিবীতে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকল অগণিত মানুষ।

তাদের মধ্যে আশা নিরাশার ঝড়, আশংকার ব্যাকুলতা ও সাফল্যের প্রত্যাশা।

আশ্চর্য বিজ্ঞানের কলাকৌশল। শূন্যপথ অতিক্রম করে সুতীব্র বেগে নির্দিষ্ট গতিপথে সত্যই মহাকাশ যানে চাঁদের দেশের আওতায় পেঁছে গেল।

এবার মূল মহাকাশ যানের চালক কলিন্স রইলেন মূলযানে এবং অধ্যক্ষ আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন ঈগল নামে আর একটি যানে উঠে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করতে লাগলেন। এবং 'ঈগল' হল চাঁদের দেশে নামবার ভেলা।

সত্যই অসাধ্য সাধিত হল। ঈগল চাঁদের মাটি স্পর্শ করল। ভেলা থেকে মই বেয়ে চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন আর্মস্ট্রং অলড্রিন 'ঈগল' নামে আর একটি যানে উঠে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করতে লাগলেন।

ভেলা থেকে মই বেয়ে চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন আর্মস্ট্রং।

এই দিনটি ১৯৬৯-এর ২১শে জুলাই। মর্ত্য মানবের চন্দ্র অবতরণের অমর ও স্মরণীয় দিন।

তার কিছুক্ষণ পরে চাঁদের মাটিতে নামলেন অলড্রিন।

দুজনে মিলে চাঁদের ধুলো সংগ্রহ করলেন। পাথর নুড়ি সংগ্রহ করলেন, চাদের দেশের নানা ছবি তুললেন। এবং চাঁদের মাটিতে স্থাপন করলেন মানুষের চন্দ্র বিজয়ের স্মৃতি ফলক।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা চাঁদে থেকে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন আবার দুজনে গিয়ে উঠলেন, এবং মূল মহাকাশ যানের সঙ্গে মিলিত হলেন।

এবার ঘরে ফেরার পালা। তাতেও বিপদের ঝুঁকি অল্প ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে করে না।

বাধা কেটে চলাই বিজ্ঞানের কাজ। যান্ত্রিক নিয়মে 'ঈগল' যথাবিধ মূল মহাযানের সঙ্গে মিলিত হল।

কিছু পরে 'ঈগল'কে পৃষ্ঠে জুড়ে নিয়ে মূল যান ফিরতে লাগল পৃথিবীর দিকে। আবার মহাকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে মহাকাশ যানটি নির্বিঘ্নে থামল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে।

সে তারিখটি হল—২৪শে জুলাই ১৯৬৯।

মানুষ এর আগে চাঁদ সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। চন্দ্র জয়ের ফলে তার থেকে আরও অনেক নতুন তথ্য জানা গেল।

চাঁদে বায়ু নেই, জল নেই। কাজেই চাঁদে প্রাণের বিবাদের কথাই ওঠে না। নিস্প্রাণ এই চাঁদের দেশ তবু নাকি সুন্দর অদ্ভুত সুন্দর।

চাদের মাটির উপরকার স্তরে রয়েছে পাউডারের মত পিছল ধুলো তাতে ইতস্তত ছড়ানো আছে ছোট বড় নানা রকমের নুড়ি পাথর।

চাঁদের রাজ্যে মানুষের দৃষ্টি বেশীদূর যেতে পারে না।···

তবু তার মধ্যে দেখা গেছে ছোট বড় পাথরের কোথাও জ্বালামুখ।

চাঁদের বয়স নাকি সাড়ে চারশ কোটি বছর—

প্রায় পৃথিবীর সমান।

অথচ পৃথিবী শষ্যশ্যামল ··· কোটি কোটি প্রাণীর কল-কোলাহলে জীবন্ত।

কিন্তু চাঁদ এখনো জড়পিণ্ড মাত্র।

ডিনামাইট আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেল

আলফ্রেড নোবেল সুইডেন দেশের একজন রাসায়নিক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় সত্তর কোটি টাকার সম্পত্তি দান করে যান।

যাঁরা বিজ্ঞান জগতে নতুন তত্ত্ব দান করেন, যাঁরা সাহিত্যের উন্নতি করেন, এবং বিশেষভাবে যাঁরা জগতে শান্তি স্থাপনের বিষয়ে সহায়তা করেন, প্রতি বৎসর তাঁদের সম্মানের জন্য এই সমিতির আয় থেকে নোবেল প্রাইজ নামে লক্ষাধিক টাকার অর্থ দেওয়া হয়। যেকোন দেশের যেকোন লোক এই অর্থ লাভের যোগ্য হলে তা পেতে পারেন।

আলফ্রেড নোবলের জীবনের কাহিনী অদ্ভুত।

দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে, রুগ্ন ও ভগ্ন দেহে তিনি সারা জীবন কাটিয়েছিলেন।

এক দিকে তিনি অত্যন্ত ভীরু ও নিরীহ ভালো মানুষ ছিলেন, সামান্য দুঃখ যন্ত্রণা বা উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে পড়তেন।

কিন্তু অপর দিকে তাঁর মনের এমন অসাধারণ বল ছিল যে যে ঘোর বিপদের মধ্যে রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি শান্তভাবে কাজ করে যেতেন।

সমস্ত জীবনে তিনি বোমা ও বারুদের মশলা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করেছেন। এই পরীক্ষায় যেসকল সময়ে প্রাণটি হাতে করে চলতে হয়, তা তিনি জানতেন, এতে যে অনেক লোকের প্রাণ গিয়েছে, তাও তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু সে চিন্তা তাঁকে নিরস্ত করতে পারে নি!

আলফ্রেড নোবেলের পিতা রাশিয়ার অস্ত্র কারখানার কারিগর

ছিলেন। গোলা বারুদ নিয়ে তাঁর কারবার এবং সেই কাজে বালক নোবেলও তাঁর সহায় ছিলেন। কেবল যে যুদ্ধের কাজেই বারুদের ব্যবহার হয় তা নয়, তার একটি মস্ত কাজ পাহাড় ভাঙ্গা।

রেলপথ বসাবার জন্য এবং রাস্তাঘাট সুড়ঙ্গ খুঁজবার জন্য অনেক সময় পাহাড় ভেঙে সমান করতে হয়। কোদাল ঠুকে এই কাজ করতে গেলে অসম্ভব রকমের পরিশ্রম ও সময় নষ্ট হয়।

সাধারণতঃ বারুদের সাহায্যে এ কাজ অনেকটা সহজ হয়, কিন্তু বারুদের তেজ সব সময়ে এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

নোবেলের সময় অনেক জিনিসের কথা লোকে জানত। তার তেজ বারুদের চাইতে ভয়ানক।

কিন্তু এই সমস্ত জিনিস এত সামান্য কারণে ফেটে যায় তাকে কাজে লাগাতে কেউ সাহস পেত না।

কাজ করতে গিয়ে সামান্য একটু গরম বা সামান্য একটু আঁচড় অথবা ধাক্কা লাগলে সব বাড়ি উড়ে এক প্রবল কাণ্ড বেঁধে যেত।

নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করে সে অসুবিধা দূর করেন।

ডিনামাইট শক্তি সাধারণতঃ বারুদের চাইতে আট গুণ বেশী। অথচ তাকে সাবধানে নাড়াচাড়া করলে কোনো ভয়ের কারণ নেই।

ডিনামাইট ছাড়াও তিনি আরো অনেক রকম বারুদের মশলা আবিষ্কার করেন। আজকাল কামানের গোলা ছুঁড়বার জন্য সে সকল প্রচণ্ড বারুদ ব্যবহার হয় তাও নোবেলের আবিষ্কারের ফল। এই সমস্ত সাংঘাতিক জিনিসের কারবারের জন্য নোবেল বড় বড় কারখানা বানিয়ে তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন।

একবার এক কারিগরের অসাবধানতার জন্য সমস্ত কারখানাটি উড়ে যায়, এবং অনেক লোক মারা পড়ে।

তাতেও নোবেলের উৎসাহ কমে নি। তিনি আবার নতুন করে কারখানা গড়লেন। এবং এরূপ দুর্যোগ যাবে না হয় তারজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

কারখানার ভিতরে যদি ঢুকে দেখা যায় তা হলে বোঝা যাবে, সাবধান হওয়া কাকে বলে ?

যেসকল স্থানে বিপদের সম্ভাবনা সেখানে প্রত্যেক ঘরের চারিদিকে মাটি উঁচু করে পাহাড়ের মতো দেওয়াল হয়েছে।

ঘরগুলো খুব হাল্কা করে তৈয়ারী, তার মেঝের উপর পুরু চট মোড়া। যারা কাজ করে তাদের পায়ে কাপড়ের জুতো, কোথাও কোনো শব্দ করবার নিয়ম নেই।

সেখানে আগুন জ্বালানো দূরে থাকুক, কারখানার ত্রিসীমানার মধ্যে দিশলাই আনতে দেওয়া হয় না।

কোন রকম লোহার জিনিষ সেখানে আনা নিষেধ।

কাঁটা পেরেক পর্যন্ত আনবার উপায় নেই।

এই রকমের অসংখ্য নিয়ম নিষেধ মেনে তবে কারখানা চালাতে হয়।

ভগ্ন শরীরে এই রকম সাংঘাতিক জিনিসের বার বার কাজে নিত্য বিপদের মধ্যে তাঁর জীবন কাটল। মৃত্যুকালে তাঁর শেষ চিন্তা ছিল শান্তি স্থাপনের। জ্ঞান ও আনন্দ বিস্তারেরজন্য তিনি সর্বদা করেছিলেন।

কিন্তু কেবল এই দানই নোবেলের শ্রেষ্ঠ দান নয়। ডিনামাইট

প্রভৃতি যে সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র তিনি জগৎকে দিয়ে গেলেন সেও সামন্য দান নয়।

যুদ্ধের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যায়, সভ্য মানুষের যে সমস্ত বড় বড় কীর্তি, তার অনেক গুলোই সহজ ও সম্ভব হয়েছে কেবল নোবেলের ঐ অস্ত্রের গুণে।

মাটি উড়িয়ে পাহাড় কেটে, পাথর সরিয়ে পথে যত রেলপুল বসানো হয়েছে, খাল কেটে, নদীর পাড় ভেঙে, জলের স্রোতকে নানা দিকে চালনা করা হয়েছে। যান ব্যবসায়ীরা যান খুঁজতে পাঁচ মাসের কাজ পাঁচ মিনিটে সেরেছেন।

নেপোলিয়ন যখন ইটালী বিজয় করতে চললেন, তখন সকলে বলেছিলেন, কী অসম্ভব কথা! এই দুরন্ত শীতে তুমি সৈন্য নিয়ে আল্পস পাহাড় পার হবে কেমন করে? নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'আল্পস পাহাড় থাকবে না। (There shall be no Alps) অর্থাৎ আল্পস পাহাড় আমায় বাধা দিতে পারবে না।

নেপোলিয়ন আল্পস পার হয়ে চলে গেলেন।

তারপর প্রায় শত বৎসর পরে যখম ফ্রান্স, ইটালী ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে আল্পস পাহাড় ভেদ করে রেল পথ বসানো হয়েছিল …তখন নোবেলও বলতে পারতেন 'There shall be no Alps'.

লক্ষ যুগের পাহাড়ের বাঁধন একটি বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হয়েছিল।

অমর বিজ্ঞানী নোবেলের দান তাই চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।